পুণ্যচিত্র

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু প্রণীত

মডেল লাইব্রেরী
ঢাকা ও ময়মনসিংহ।

মূল্য ১৲ মাত্র।

পুণ্যচিত্র সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

১

ঢাকা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী M. A. মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"ব্যগ্রভাবে আপনার পুণ্যচিত্রের অধিকাংশ পাঠ করিয়াছি এবং প্রীতিলাভ করিয়াছি। চিত্রগুলি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারা যায় না।"

২

নাটোর রাজবাটীর দ্বারপণ্ডিত প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বেদান্তরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের আদরের আপনার রচিত বিচিত্র "পুণ্যচিত্র" পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আপনি যে, সকল দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া পাঠকমাত্রেরই মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছেন, ইহা অতি আনন্দের।"

৩

ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত এ, কে, গজনভী লিখিয়াছেন :—

I have read with great pleasure your work entitled "Punya chitra". The style and composition are excellent. I have seldom come across a Bengali writer who has been able to treat an essentially Musulman subject in the way that you have done. I wish you all success.

আমার প্রিয় স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর
প্রাচীন গৌরব মণ্ডিত এই

পুণ্যচিত্র

.... নিদর্শন স্বরূপ

....

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের

করকমলে

অর্পণ করিলাম।

.... } ....

তারিখ

সূচী

ঢাকা ও ময়মনসিংহ

মডেল লাইব্রেরীর

নিমিত্ত

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

২৬নং বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ

Printed by Satish Chandra Ray at the Jagat Art Press, Dacca

গ্রন্থকারের নিবেদন

কয়েকটি কিংবদন্তী ও ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া পুণ্যচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল।

সুমতি সম্পাদক সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগ, আগ্রহ, অর্থানুকূল্য ও তত্ত্বাবধানে এক্ষণে উহা প্রকাশিত হইল। তাঁহার এই সহায়তা না পাইলে পুণ্যচিত্র এরূপ ভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না। এজন্য সুহৃদ্‌বরের নিকট আমি কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। তাঁহার এ সৌহার্দ্দের ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধনীয়।

এই চিত্র দর্শনে পুণ্যের প্রতি কাহারও বিন্দুমাত্র অনুরাগের সঞ্চার হইলেই সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

নাগর পাড়া
১লা আশ্বিন, ১৩২৪

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু

উৎসর্গ পত্র

আটীয়া পরগণার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী
বিদ্যানুরাগী ও বিদ্বৎপ্রতিপালক
উদারচিত্ত
শ্রীযুক্ত মৌলবী ওয়াজেদআলী খান্ পান্নি
সাহেব বাহাদুরের
পুণ্যনামে
এই

পুণ্য-চিত্র

কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপে
ভক্তির সহিত
উৎসর্গ করিলাম।

ঈশা খাঁ

যেখানে স্বচ্ছ-সলিলা শীতল-লক্ষ্মী নদী, ব্রহ্মপুত্র হইতে জন্মিয়া মৃদু-কলনাদে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছে, সেই স্থানে ব্রহ্মপুত্রের তটপ্রদেশে এক বিশাল বন।

মেঘস্পর্শী শালতরুর ঘনসন্নিবেশে সেই বনভূমি কোথায়ও নিবিড় অন্ধকারময়, আম্র-পনশাদি ফলবৃক্ষে কোথায়ও উপবনবৎ রমণীয়, এবং শ্যাম-শষ্পাচ্ছাদিত সমতলক্ষেত্রে কোথায়ও বা স্নিগ্ধ ও শান্তিময়ী।

সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে একদিন মধ্যাহ্নে একজন অশ্বারোহী সেই নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিলেন। অশ্বারোহী নবীন যুবক; শালতরুর ন্যায় তাঁহার দেহ উন্নত, ললাট বিস্তৃত, চক্ষু উজ্জ্বল। যুবকের কটিতে অসি, দক্ষিণ হস্তে বর্শা। সে কালে হাতিয়ার না লইয়া কেহ ঘরের বাহির হইত না। দেশের সর্ব্বত্র দস্যু ও শ্বাপদের ভয় ছিল।

যুবক শ্রান্ত; অনেক দূর হইতে দ্রুতবেগে আসিয়াছেন। বনপ্রান্তে আসিয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতেছে কিনা। তাহার পরে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বটবৃক্ষতলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন।

অশ্ব ও অশ্বারোহী দুইয়েরই শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল। কিছু কাল স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া যুবক অশ্বের বল্গা বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিলেন; এবং কি ভাবিতে ভাবিতে বর্শা হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে বনের অভ্যন্তর ভাগের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিছু দূর যাইয়া যুবক দেখিলেন, সম্মুখে আমলকী বৃক্ষতলে এক বৃদ্ধ ফকীর ধ্যান-নিমীলিতনেত্রে বসিয়া আছেন। তাঁহার উন্নত গৌরদেহ ও আবক্ষোবিলম্বী শ্বেতশ্মশ্রুর শুভ্রজ্যোতিতে সে বনভূমি যেন আলোকিত হইয়াছে। যুবক কিছুকালের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইলেন বর্শা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ক্ষণেকের জন্য কিছু ভাবিলেন। তাহার পরে অগ্রসর হইয়া ফকীরকে সেলাম করিলেন।

যুবকের পদশব্দেই হউক কি অন্য কারণেই হউক, ফকীরের ধ্যানভঙ্গ হইল। সেই বর্ষীয়ান্ পুরুষ, একবার যুবকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুহাস্যে কহিলেন,

ভৌমিক, জঙ্গলবাড়ী, (১) আক্রমণের কোন সুযোগ দেখিলে কি ?

এই অসম্ভাবিত প্রশ্ন শুনিয়া যুবক বিস্ময়ে ফকীরের মুখের দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সেই নিবাত নিষ্কম্প সরোবরের ন্যায় প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কপটতার কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া কহিলেন, এই নির্জ্জন বন-প্রদেশে এইরূপ প্রশ্ন শুনিবার সম্ভাবনা করি নাই। উত্তর দিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন।

ফকীর কহিলেন, তুমি একক, না আরও সঙ্গী আছে ?

যুবক – আপাততঃ সঙ্গী এই বর্ষামাত্র।

ফকীর—উত্তম। শুন, লক্ষ্মণহাজরার রাজত্ব অধিক দিন থাকিতেছে না। হাজরা, রাজধর্ম্ম পালন করে না। মানুষ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলে তাহার বিনাশের দিন নিকটবর্ত্তী হয়। হাজরা স্বধর্ম্ম পালন না করিয়া আপনি আপনার বিনাশ ডাকিয়া আনিতেছে। তুমি আক্রমণ কর বা না কর, বিশ্ব-বিধাতার ইচ্ছাতেই অচিরে তাহার পতন হইবে।

যুবক—আপনি কে ?

(১) জঙ্গলবাড়ী, এক্ষণে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত, পূর্ব্বে এই স্থানে লক্ষ্মণ হাজরা নামে এক ভূঞার রাজধানী ছিল। ঈশা খাঁ জঙ্গলবাড়ী অধিকার করিয়া স্বীয় ভাটীরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ফকীর—দেখিতেছনা আমি ফকীর? ফকীরের ইহার অধিক পরিচয় কিছু নাই।

যুবক—আপনি কোথায় থাকেন?

ফকীর—এগারো সে দূর।

যুবক—বুঝিতে পারিলাম না। এই বনভূমিরই কি এই নাম?

ফকীর হাসিয়া কহিলেন, তুমি এ অরণ্যের এই নাম দিয়া নগর পত্তন করিতে পার। ইহা ভাটী মুল্লুকের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য স্থান হইবে। তোমার রাজধানীর পক্ষে এই বন উত্তম স্থান। কিন্তু বাছা, এগারো সে দূর থাকা চাই।

যুবক—আপনার শেষের কথা বুঝিতে পারিলাম না।

ফকীর বলিলেন—জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, আর মন এক এই এগার হইতে দূরে থাকা চাই—ইহাদিগকে আপনার বশে রাখা চাই। নতুবা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই বিষয়-পঞ্চকের আকর্ষণে মানুষের পতন অবশ্যম্ভাবী। দেখ:—

> "অলি, পতঙ্গ, মৃগ, মীন ঔর গজরাজ,
> ইয়াকো একোহি আঁচ,
> তুলসী, ওয়াকো ক্যা গত্ হায়,
> যাকো পিছু পাঁচ?"

পুণ্য-চিত্র

ভ্রমর, পতঙ্গ, হরিণ, মৎস্য ও হস্তী এই পাঁচ জন্তুর প্রত্যেকে এক একটি ইন্দ্রিয় পথে এক একটি বিষয় ভোগ করিতে যাইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তবে "যাকো পিছু পাঁচ"—যাহারা পাঁচ ইন্দ্রিয় পথে পাঁচটি বিষয়ই ভোগ করিতে চায়, তাহাদের কি গতি ?

দেখ, আগুনের উজ্জ্বল রূপ দেখিয়া পতঙ্গ কেমন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ; মাংসের রসের আকর্ষণে মাছ, বড়শীতে বিদ্ধ হয় ; বাঁশীর স্বরে মুগ্ধ হইয়া হরিণ প্রাণ দেয় ; ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর আবদ্ধ হয় এবং করিণীর স্পর্শসুখের জন্য বন্য গজের বন্ধন ঘটে। এক একটী ইন্দ্রিয়ের বাধ্য হইয়া এক একটি বিষয়ের আকর্ষণেই ইহাদের পতন হয়। মানুষ, পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচটি বিষয় ভোগ করে, মানুষের পাছে পাঁচের আকর্ষণ লাগিয়াই আছে, সুতরাং তাহার পতন কত সহজ ও কত সম্ভব, বুঝিতেই পার। তাই, তোমাকে 'এগোরো সে দূর' থাকিতে বলিয়াছি। রূপ রসের মোহে মানুষ, আপনার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, কর্ত্তব্য ভুলিলেই বিনাশের দিন আসিয়া পড়ে।

যতদিন তুমি 'এগারো সে দূর' থাকিবে, ততদিন তোমার পতন হইবে না। এখন আমার সঙ্গে এস।

এই বলিয়া ফকীর যুবককে সঙ্গে লইয়া অরণ্যের এক দুর্গম প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই দিকে বৃহৎকায় শালতরুর শ্রেণী; তাহাদের শাখা প্রশাখার বিস্তারে মধ্যাহ্নেও সে স্থান অন্ধকারাবৃত। সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে, কোথাও পথের চিহ্ন মাত্রও নাই; মানুষ এ বনে যাতায়াত করে না। কিন্তু ফকীর. চিরপরিচিতের মত, সেই পথহীন বনভূমি দিয়া চলিলেন। যুবকের বিস্ময় জন্মিল, কোথায় যাইতেছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একবার মনে করিলেন ফকীরকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু ফকীরের গতি অবিরাম; প্রশ্নের অবসর নাই। কাজেই যুবক অদৃষ্ট-চালিতের মত নিঃশব্দে তাঁহার পাছে পাছে যাইতে লাগিলেন। কোথা যাইতেছেন, এ প্রশ্ন করিতে পারিলেন না।

এই ভাবে কিছু দূর যাইবার পরে, ফকীর, সম্মুখে এক ভগ্নদুর্গ দেখাইয়া কহিলেন, আমাদিগকে উহার মধ্যে যাইতে হইবে। যুবক কহিলেন, চলুন।

নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যে বিশাল দুর্গের বিধ্বস্তবপুঃ, বিরাটকায় রাক্ষসের শবদেহের মত পড়িয়া আছে। কালের কত আঘাত উহার উপর দিয়া গিয়াছে, সংখ্যা নাই। ফকীর, যুবককে কহিলেন এই দুর্গ কাহার বা

কত কালের কেহ জানে না। দুর্গ যাঁহারই হউক, তিনি যে এ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার প্রতাপ ও সমৃদ্ধি যে অপরিমিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাছা, মানুষের গর্ব্বের কি শোচনীয় পরিণাম! এমন প্রতাপশালী যিনি ছিলেন তিনি যে এ অরণ্যের কোন্ ধূলিতে মিশিয়া আছেন, তাহারও ঠিকানা নাই।

যুবক কহিলেন—শাহান্ শা, তবে মানুষ, নাম রাখিবার জন্য এত আয়োজন, এত আড়ম্বর করে কেন? পাপই বলুন, আর পুণ্যই বলুন, নামের জন্যইত মানুষ প্রাণপাত করিয়া উহার অনুষ্ঠান করে।

ফকীর—ঠিক বলিয়াছ। মানুষ চিরদিন পৃথিবীতে থাকিতে চায়, অমর হইতে চায়, কিন্তু মানুষ ইহাও জানে সে অমর হইতে পারিবে না। যৌবনে মনে না হইলেও বার্দ্ধক্যে একথা মনে হয়; আপনি মনে না হইলে জরা আর ব্যাধি আসিয়া মনে করিয়া দেয়। তখন মানুষ বুঝে, এ দেহে সে অমর হইতে পারিলনা, তাহাকে পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। কিন্তু পৃথিবীতে থাকিবার টান, বড় বেশি টান, তাই যেমন করিয়া হউক —প্রাসাদ মন্দির গড়িয়া এ ভবের হাটে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া যাইতে চায়। কিন্তু তাহারা

বুঝেনা, যে, ইট ও পাথর তাহাদের নশ্বর দেহের মতই ভঙ্গুর এবং অমরত্ব. আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নহে, আত্ম-বিসর্জ্জনে যাহারা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে. গিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই এই দশা হইয়াছে ; ইট ও পাথর তাহাদিগকে অমর করিতে পারে নাই। কিন্তু যাহারা আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছেন. তাহারাই অমর-বর পাইয়াছেন। ভৌমিক, বিসর্জ্জনেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ; প্রতিষ্ঠায় নহে। যদি বাঁচিতে চাও, মরিতে শিখিও ; অমর হইতে চাও ত আত্ম-বিসর্জ্জন করিও।

যুবক. মুগ্ধচিত্তে ফকীরের কথা শুনিতেছিলেন. শুনিতে শুনিতে তাঁহার চিত্তের সম্মুখে এক নূতন জগৎ যেন উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। ভক্তিভরে ফকীরের পদধূলি লইয়া কহিলেন. আমি আপনার মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।

ফকীর. প্রফুল্লমুখে কহিলেন. আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সিদ্ধিলাভ হউক। এস, দুর্গের মধ্যে যাইতে হইবে।

প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া ফকীর যুবককে ভূগর্ভস্থ এক গুপ্তগৃহে লইয়া গেলেন। সেখানে স্তূপে স্তূপে দ্রম, দীনার. স্বর্ণ. রৌপ্য, মুক্তা সজ্জিত

রহিয়াছে, দেখিয়া যুবকের বিস্ময় জন্মিল। ফকীর কহিলেন, কতকাল ধরিয়া এই অর্থ এইস্থানে সঞ্চিত রহিয়াছে, কিন্তু কাহারও কাজে আসিতেছে না। তুমি এই অর্থরাশি গ্রহণ করিয়া ভাটী মুল্লুকে শান্তি ও সুখের প্রতিষ্ঠা কর। এ অরাজক দেশ, চৌরদস্যুর উপদ্রবে জনশূন্য হইয়া যাইতেছে, উৎপীড়িত দুর্ব্বলপ্রজার হাহাকারে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইতেছে, বিশ্ব-বিধাতা আর সহিতে পারিতেছেন না। ঈশা, তুমি, বিপন্নের রক্ষক হও। তোমার বাহুতে শক্তি আছে, হৃদয়ে সাহস আছে, চক্ষুতে প্রতিভা ও করুণা দেখিতেছি। তুমি এ ভার গ্রহণ কর।

ঈশা—শাহান্ শা, আমি ক্ষুদ্র, এ ভার আমি বহিতে পারিব কি ?

ফকীর—যদি আপনার জন্য কিছু না কর, তোমার একগুণ শক্তি, শত গুণ হইবে। তুমি অমর হইবে। কিন্তু বৎস, মনে রাখিও, মানবের অমরতা, প্রতিষ্ঠায় নহে, বিসর্জ্জনে।

ঈশা, ফকীরের পদধূলি লইয়া করযোড়ে বলিলেন, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি এ ব্রত গ্রহণ করিলাম।

ফকীর, আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কোন্ পথে কোথায় গেলেন, ঈশা বুঝিতে পারিলেন না।

কিছুকাল, মুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঈশা বাহিরে আসিলেন। তাহার পরে অশ্বে আরোহণ করিয়া কাটা'ব' চলিয়া গেলেন। কাটা'ব' তাঁহার রাজধানী ছিল।

ফকীরের প্রদর্শিত অর্থে ঈশা ব্রহ্মপুত্রতীরে দুর্গ ও নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার নাম রাখিলেন 'এগারো সে দূর', লোকে বলিতে লাগিল, এগার সিন্দুর। এগার সিন্দুর, ভাটী বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্য স্থান হইল।

ঈশা, জঙ্গলবাড়ী আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। ক্রমে সমস্ত ভাটী প্রদেশ তাঁহার হস্তগত হইল। ভাটীর অন্যান্য ছোট ছোট ভূঞারা তাহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। ঈশা, ভাটি প্রদেশের "মর্জ্জবান" (১) হইয়া সেই অরাজক দেশে শান্তি স্থাপনের আয়োজন করিলেন।

---

(১) প্রধান শাসনকর্ত্তা।

ডাক্তার ওয়াইজ ঈশার্খার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

He is described by Abul Fazel as the Maizbon of Bhati or Governor over Lower Bengal and as the ruler over twelve great Zaminders.

তখন দিল্লীর সম্রাট্ সলিমসাহ শূরের মৃত্যু হইয়াছে। তাজ খাঁ, বাঙ্গালা অধিকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছেন। ঈশা, তাজ খাঁর সহিত বিরোধ ঘটাইলেন না, কিছু কিছু উপঢৌকন পাঠাইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই দিল্লীতে পাঠান আধিপত্যের অবসান হইল। মোগল সম্রাট্ হুমায়ুন দিল্লী পুনরাধিকার করিলেন। সে সকল ইতিহাসের কথা, বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

(২)

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ। জালালউদ্দীন আকবর-বাদশাহ গাজী দিল্লীর সম্রাট্। প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত বাদশাহ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, কেবল বঙ্গদেশ তখনও স্বাধীন। বাঙ্গালা মুল্লুকের দ্বাদশ জন হিন্দু ও পাঠান ভৌমিক, মোগলের দিগ্বিজয়ী প্রতাপের নিকট তখনও মস্তক অবনত করেন নাই। বাঙ্গালার দুর্গে দুর্গে, জলে ও স্থলে তখনও হিন্দু ও পাঠানের নিশান উড়িতেছিল।

বাদশাহের রাজস্ব-সচিব তোড়লমল্ল বাঙ্গালায় আসিলেন; বিশাল মোগল-বাহিনীর পদভরে বাঙ্গালার

ভূমি কাঁপিয়া উঠিল। ভূঞারা প্রমাদ গণিলেন। আসল তুমার জমার (১) নির্দ্দিষ্ট ‘ দাম ’ এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অশ্বারোহী, পদাতি, ও নৌকা যোগাইতে স্বীকার করিয়া ভৌমিকগণ আপনাদের প্রভুত্ব বজায় রাখিলেন। বাঙ্গালায় মোগল বাদশাহের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজা

---

(১) ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা তোড়লমল্ল, মোগলসাম্রাজ্যের রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তুত করেন। এই হিসাবের নাম ‘আসল তুমার জমা।’ হিন্দু রাজত্বে উৎপন্নের এক ষষ্ঠাংশ এবং শেরশাহের সময় এক চতুর্থাংশ রাজকর নির্দ্দিষ্ট ছিল। বাদসাহ আকবরের সময় উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ রাজকর নির্দ্দিষ্ট হয়। আসল তুমার জমায় সুবে বাঙ্গলার রাজস্ব মোট ১০৬৯৩২৬০ দাম নির্দ্ধারিত হয়। সমগ্র বঙ্গদেশ ১৯ সরকার ও ৬৮২ মহাল বা পরগণায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পরগণা ও সরকারের দেয় রাজস্ব নির্দ্দেশ করা হয়। এই নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত প্রত্যেক সরকার হইতে বাদশাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্য যোগাইতে হইত. কোন কোন মহালে ‘নাওরা’ বলিয়া অভিহিত ছিল। এই সকল মহাল হইতে বাদশাহের যুদ্ধপোতের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। আইন আকবরীতে লিখিত আছে, আকবরের রাজত্বে বঙ্গদেশীয় ভূঞার ২৩৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১১৫০ পদাতি, ১১০ হস্তী, ৪২৬০ কামান এবং ৪৪০০ রণপোত সর্ব্বদা সম্রাটের জন্য সজ্জিত রাখিতেন।

তোড়লমল্ল, বিনা যুদ্ধে কেবল বুদ্ধিবলে বাঙ্গালাবিজয় করিয়া আগ্রা চলিয়া গেলেন।

কিন্তু এই বুদ্ধির বিজয় বাঙ্গলায় অধিক দিন স্থায়ী হইল না। বারভূঞার মধ্যে কাহারও মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে আন্তরিক ইচ্ছা ছিলনা। সকলেরই আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত। পাঠান আবার দিল্লীর বাদশাহী চাহিতেছিলেন; হিন্দুভৌমিকেরা মোগলপাঠানের দ্বন্দ্বের সুযোগে উভয় বিদেশীকেই সিন্ধুনদের পর পারে তাড়াইয়া দিয়া ভারতব্যাপী হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করিতেছিলেন। দেশ অরাজক; ছোটবড় সকল ভূঞাই এই সুযোগে বাদশাহী প্রাপ্তির কুহকে আপন আপন নাওরা (১) অশ্বারোহী, ঢালী ও তীরন্দাজের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন। অনেকেই বাদশাহের প্রাপ্যরাজস্ব প্রদান বন্ধ করিলেন।

বার ভূঞার মধ্যে ঈশা খাঁর অধিকার ও সৈন্য সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। বিদ্রোহী পাঠানগণ, তাঁহার অধিকারে আশ্রয় লইয়াছে, ঈশা অসংখ্য কোষা নির্ম্মাণ করিয়া সোণার গাঁয়ে সজ্জিত করিতেছেন, এগার সিন্দুর ও খিজিরপুর দুর্গে তাঁহার নামাঙ্কিত ব্যাঘ্রমুখ

(১) নাওরা—নৌকার বহর।

কামান সমূহ নির্ম্মিত হইতেছে, কলাগাছিয়া ও হাজিপুরে অপরিমিত খাদ্য ও রণসম্ভার সংগৃহীত হইতেছে—এ সংবাদ আগ্রায় পঁহুছিল। বাদশাহ ঈশা খাঁকে বিদলিত করিবার জন্য দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ কম্বুকে বাঙ্গালার সুবেদার করিয়া পাঠাইলেন।

(৩)

বাদশাহী সৈন্য আগ্রা হইতে 'কুচ' করিয়া তিনমাসে 'তিলিয়া গড়ী' পঁহুছিল। 'তিলিয়া গড়ী' বাঙ্গালার প্রবেশ দ্বার। সেই 'গড়ী' পথে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া সরকার ঘোড়াঘাট ও সরকার বাজুহার (১) মধ্যদিয়া সাহাবাজ

---

(১) রাজা তোড়লমল্ল সমগ্র বঙ্গদেশ ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। সরকার ঘোড়াঘাট ও সরকার বাজুহা সেই ১৯ সরকারেরই দুইটী সরকার। বাদশাহী আমলের সরকার বর্ত্তমান সময়ে জেলার মত ছিল। সরকার ঘোড়াঘাট, বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলা এবং সরকার বাজুহা বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা। সরকার বাজুহা বুড়ীগঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঢাকা নগর বাজুহার অন্তর্গত ছিল। বাজুহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও দক্ষিণে সরকার সোণারগাঁ; বিক্রমপুর প্রভৃতি পরগণা, সরকার সোণারগাঁর অন্তর্গত ছিল। সোণারগাঁ, বাজুহা ও ঘোড়াঘাট এই তিন সরকারের মধ্যেই ঈশাখাঁর অধিকার ছিল।

খাঁ একবারে 'ভাটী'র প্রবেশ-দ্বার-খিজির পুরের (১) সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে ঈশাখাঁও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। গুপ্তচরের মুখে বাদশাহী সৈন্যের আগমন সংবাদ পাইয়া ঈশা আপনার পরিবারবর্গ ও মূল্যবান রত্নাদি এগার সিন্দুরের দুর্ভেদ্য দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং খিজিরপুরের দুর্গ প্রকারে কামান সাজাইয়া মোগলসৈন্যের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রভাত না হইতেই মোগলের সহস্র কামান ভীষণরবে গর্জ্জন করিয়া অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। ঈশা খাঁর গোলন্দাজগণও নীরবে রহিল না। তাহারাও দুর্গপ্রাকার হইতে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। বারুদের ধূমে শীতললক্ষীর উভয়তীর অন্ধকারাবৃত হইয়া গেল। উভয়তীরে কামান-শ্রেণী মেঘের মত গর্জ্জিতে লাগিল।

অল্পদিন হইল নারায়ণগঞ্জের নিকট দেওয়ানবাগের মৃত্তিকাভ্যন্তরে ঈশা খাঁর নামাঙ্কিত ব্যাঘ্রমুখ কামান পাওয়া গিয়াছে। উহাতে লিখিত আছে:—

"সরকার শ্রীযুক্ত ইছাখানে মসনন্দালী সন হাজার
১০০২ "

(১) আকবর নামায় লিখিত আছে,—ভদ্র দরিয়ার পারে খিজিরপুর, উহা ভাটীর প্রবেশ দ্বার।

ঈশা খাঁ, সেনাপতি মহব্বৎকে বলিলেন, এদিকে মোগল সেনাপতি অগণিত সেনা লইয়া আসিয়াছেন, ওদিকে পদ্মার পথে বাদসাহের 'নাওরা' আসিতেছে, সংবাদ পাইয়াছি। এখন কর্ত্তব্য কি ?

মহব্বৎ, তরুণবয়স্ক বীর ; দৃঢ়মুষ্টিতে তরবারী ধরিয়া কহিল, প্রাণপণে যুদ্ধ করিব। এ ভাটী মুল্লুকে মোগলের নিশান উড়িবে, প্রাণ থাকিতে তাহা দেখিতে পারিবনা।

ঈশা খাঁ, প্রফুল্লমুখে কহিলেন,—একটি পাঠানও যে প্রাণথাকিতে মোগলের হাতে এক 'কাণি' ভূমি ছাড়িয়া দিবে না, তাহা জানি। কিন্তু আজিকার যুদ্ধে কেবলই লোকক্ষয় হইবে দেখিতেছি। মোগলের কামানের মুখে এই জীর্ণ-দুর্গের প্রাচীর অধিকক্ষণ টিকিবে না। বাদশাহের 'নাওরা' আসিয়া পড়িলে আমরা দুইদিক্ হইতে আক্রান্ত হইব। তখন এক প্রাণীও রক্ষা পাইবে না। যে যুদ্ধের পরিণাম, কোনই মঙ্গল আনয়ন করেনা, তাহা নরহত্যা মাত্র। আমি সে পাপ করিতে ইচ্ছুক নহি। বল-দর্পিত মোগল সেনাপতিকে আমি দুর্গ ছাড়িয়া দিব স্থির করিয়াছি। আর অনর্থক কামান দাগিয়া বারুদ খরচ করিতেও ইচ্ছা নাই। তোমরা

জনকয়েক গোলন্দাজ মাত্র রাখিয়া 'নাওরা' লইয়া সাগর অভিমুখে চলিয়া যাও। আমি পাছে আসিতেছি।

তাহাই হইল। ঈশাখাঁর সৈন্যগণ ছিপ ও কোষায় উঠিয়া মেঘনার জলে ঢেউ তুলিতে তুলিতে দক্ষিণমুখে যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই বিশাল নৌবাহিনী—ছিপ, কোষ, বজ্‌রা ও ভাওলিয়ার শ্রেণী—অদৃশ্য হইয়া গেল, আর দেখা গেল না।

যে কয়েকজন গোলন্দাজ দুর্গে রহিল, ঈশা তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা আরও কিছুকাল মোগলের সহিত কামানের খেলা কর। বাদশাহের কিছু বারুদ খরচ হউক।

৪

মোগলের কামান, অনবরত অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিল। কিছুকাল পরে সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ দেখিলেন, দুর্গের কামান শ্রেণীর গোলাবর্ষণ কমিয়া আসিল। পাঠানেরা ক্ষণকাল পরে পরে দুই চারিটি কামান দাগে, তাহার পরে আবার কিছুকালের জন্য নীরব হয়। সাহাবাজ বুঝিলেন, ইহা যুদ্ধ নহে, পাঠানেরা কৌশল করিয়া মোগলের গোলা বারুদ খরচ করাইতেছে, আর ওদিকে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে। মোগল সেনাপতি,

সৈন্যদিগকে নদী পার হইয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন।

মোগল সৈন্য যখন নদী পার হইতেছিল সেই অবসরে ঈশা খাঁ, গোলন্দাজ সৈন্য সহ ছিপে চড়িয়া সাগর অভিমুখে চলিয়া গেলেন। দুর্গে একটি প্রাণী বা একটি গোলাও রহিল না।

মোগল সৈন্য নিরাপদে নদী পার হইল। তাহার পর সারি বাঁধিয়া দুর্গের অভিমুখে যাইতে লাগিল, কেহ তাহাদিগকে বাধা দিল না। সাহাবাজ খাঁ উচ্চৈঃস্বরে আদেশ করিলেন, বর্ষার আঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া দুর্গে প্রবেশ কর।

সহস্র বর্ষার যুগপৎ আঘাতে দুর্গদ্বার ভগ্ন হইল। পিপীলিকা-শ্রেণীর মত মোগলসৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিল। কিন্তু দুর্গ, জনহীন, খাদ্যহীন, রণসম্ভার শূন্য। পাঠানের চিহ্নমাত্রও সেখানে নাই। সাহাবাজ আদেশ করিলেন, এখনই শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইবে। পাঠানেরা নিশ্চয়ই ভাটী অভিমুখে পলাইয়া গিয়াছে।

তখন মোগলের 'নাওরা' আসিয়া পঁহুছিয়াছে। সৈন্যগণ আর বিশ্রাম করিতে অবসর পাইলনা। কোষা, বজরা, ছিপ ও ভাওলিয়ায় চড়িয়া পাঠানের অনুসরণ করিল।

৫

মোগলের বাহিনী, মেঘনার মোহনায় আসিয়া পঁহুছিল। সম্মুখে অনন্তবিস্তৃত নীল সমুদ্র; যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলই নীল জল; পাঠানের চিহ্নও দেখা যায় না।

শ্রান্ত মোগলসেনানীরা সাহাবাজকে কহিল, হয় পাঠান ডুবিয়া মরিয়াছে, নয় আরাকাণে পলাইয়া গিয়াছে। যদি ডুবিয়া মরিয়া থাকে, উত্তম; আর যদি আরাকাণে যাইয়া থাকে, সেত মগের মুল্লুক; সেখানে গেলে আর তাহাদের প্রাণ লইয়া ফিরিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যে প্রকারেই হউক, শত্রু যে নির্ম্মূল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আপাততঃ কিছুদিন বিশ্রাম করা যাউক।

ঈশা খাঁকে বিনাশ করিয়া আগ্রার দরবারে 'খেলাত' ও 'মনসব' পাইবার আশায় সাহাবাজ বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং সেই দুষ্‌মনের ছিন্নমুণ্ড বাদশাহের নিকট পাঠাইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা একবারেই ছিলনা। কিন্তু যুদ্ধ করেন, কাহার সহিত? শত্রুদল, নিরুদ্দেশ। সৈন্য ও সেনানীরা আর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক। অগত্যা সাহবাজখাঁকে শিবির স্থাপন করিতে হইল।

মেঘনার মোহনায় অগণিত রমণীয় দ্বীপ। সাহাবাজ একটী দ্বীপের নাম সাহাবাজপুর রাখিয়া তথায় শিবির স্থাপন করিলেন। বহুদিন পরে মোগলসৈন্য যুদ্ধের সাজ খুলিয়া বিশ্রাম করিতে অবসর পাইল।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর, গতপ্রায়। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত। সেই জনহীন দেশে কেবল মোগল শিবিরে আলোক-মালা জ্বলিতেছে। সৈনিকদিগের কেহ আমোদে মত্ত, কেহবা সুপ্ত। প্রহরী, সেই অন্ধকারের মধ্যে বন্দুক স্কন্ধে লইয়া শিবির দ্বারে নিদ্রালু।

সহসা শব্দ হইল গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্। প্রহরী চমকিয়া চক্ষু মেলিল. কাঁধের বন্দুক হাতে লইল, কিন্ত অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না। শিবিরে মোগল সৈনিকেরা ভাবিল,—সমুদ্র গর্জ্জন। কেহ উদ্বিগ্ন হইল না।

আবার গুড়ুম্ গুড়ুম্। এবার শব্দ নিকটে। প্রহরী অগ্নিগোলক দেখিয়া চীৎকার করিয়া হাঁকিল—দুষ্‌মন্ আসিয়াছে। নিদ্রালু সৈনিক গণ, হাতিয়ার লইবার অবসর পাইল না, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। পাঠানের গোলার আগুনে মোগলের শিবির জ্বলিয়া উঠিল।

সাহাবাজ দেখিলেন, যুদ্ধ অসম্ভব। অগত্যা কোষা ও

ছিপে পাল তুলিয়া উত্তর মুখে পলায়ন করিলেন। মোগল সৈনিকেরা যে পারিল, নৌকায় চড়িল, যে না পারিল, পাঠানের হস্তে বন্দী হইল। ঈশার 'নাওরা' মোগলের পাছে পাছে অনেক দূর আসিল, কিন্তু উহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না।

নৌকা পথে আট দিন অবিশ্রান্ত চলিয়া সাহাবাজ দশ-কাহনিয়া সেরপুরের দুর্গে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে তিনি পুনরায় ঈশাখাঁকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু অধীন সেনাপতিরা তাহার অবাধ্য হইয়া উঠিল, কেহই আর ভাটী অভিমুখে যাইতে স্বীকার করিল না। ক্রোধে ও লজ্জায় সাহাবাজ অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

এদিকে আগ্রায় এই পরাজয়ের সংবাদ পঁহুছিল। বাদশাহ সাহাবাজকে আগ্রায় প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। তিন হাজারী মনসবদার সাহাবাজ, বাঙ্গালী ভূঞার নিকট পরাজিত হইয়া ম্লানমুখে রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

৬

বিজয়ী ঈশাখাঁ, মোগলের পাছে পাছেই খিজির পুরে আসিলেন। সাহাবাজ খাঁ খিজির পুরের দুর্গ বিধ্বস্ত

করিয়া ফেলিয়াছিলেন. এজন্য ঈশা মেঘনার তীরে সুবর্ণ-গ্রামে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার নৌ সৈন্য মোগলের অনুসরণ করিতে করিতে দশকাহনিয়া যাইয়া তত্রত্য মোগল দুর্গ অধিকার করিল। সাগরতীর হইতে কড়ইবাড়ী পর্ব্বত মালার পাদদেশ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানে ঈশার বিজয় নিশান উড়িতে লাগিল, মসজিদে মসজিদে ঈশার নাম 'খোতবা' পাঠ হইতে লাগিল। ঈশাখাঁ ভাটী মুল্লুকের বাদশাহ হইলেন। বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগে মোগলের প্রতাপ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল।

একা ঈশাখাঁ নহেন, এই সময়ে যশোহরের প্রতাপাদিত্য, শ্রীপুরের কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য প্রভৃতি ভূঞারাও মোগলের অধীনতা হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হিন্দু ও পাঠান, উভয়েই মোগলকে পর বলিয়া জানিত, কেহই মোগলের অধীন হইতে অন্তরে সম্মত ছিলনা।

পাঠান রাজত্বের অবসান ও মোগল প্রভুতার অভ্যুদয় কাল, ভারতবর্ষের বড়ই দুর্দ্দিন। এ সময় দেশ, অরাজক, প্রজা, নিঃসহায়। ঈশাখাঁ এই অরাজকতার সময়ে ভাটী প্রদেশে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সমুদয় ভূমি জরিপের পরে, প্রতি 'কাণি' জমির খাজানা, চৌদ্দ

পয়সা নির্দ্দিষ্ট হইল। চাষারা মাঠে মাঠে আনন্দে গাইতে লাগিল :—

"কাণি ক্ষেত লাগিল চৌদ্দ বুড়ি।"

হাটে হাটে টাকায় চারি মণ ধান্য কিনিতে পাইয়া দুধে 'ভাতে' বুক 'তাজা' করিয়া প্রজারা ঈশাখাঁকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। আমীর ওমরাহ দিগের আদর পাইয়া মসলিন ও জামদানীর তন্তুবায় গণের দিন সুখে যাইতে লাগিল।

৭

একদিন এগারসিন্দুর দুর্গে বেগমফতেমা খাতুন, ঈশা খাঁকে কহিলেন-- খাঁ সাহেব, শুনিয়াছি, বাদসাহ আকবর প্রবল পরাক্রমশালী ; রাজপুতগণ, তাঁহার সহায়। আপনারা কয়েকজন বাঙ্গালী ভূঞা, মোগলের কামানের মুখে কতদিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন ?

ঈশা খাঁ হাসিয়া কহিলেন,—আত্মরক্ষা নহে দেশরক্ষা। দেশরক্ষার জন্য আমরা মোগলের বিরোধী হইয়াছি। মোগল বাদশাহ এতদিন দেশ রক্ষা করিতে পারেন নাই ; চোর ও দস্যু প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠিতেছিল, অবিচার ও উৎপীড়নে দুর্ব্বলেরা আর্ত্তনাদ করিতেছিল ; অরাজ-

কত্তায় সোণারবাঙ্গালা শ্মশান হইয়া পড়িতেছিল, আমরা তাহাই নিবারণ করিয়াছি।

ফতেমা—কিন্তু দিল্লীর বাদসাহও আপনাদিগকে বিদ্রোহী বলিয়াই জানিয়াছেন। পুনরায় মোগলের সহিত আপনাদের যুদ্ধ অনিবার্য্য। যুদ্ধ ঘটিলেই লোকক্ষয় হইবে. দেশে আবার অরাজকতা আসিবে। আপনারা দেশ রক্ষা করিতে যাইয়া দেশ বিনাশ করিবেন।

ঈশা—বেগম, আগে দেশ, তাহার পরে আমি। দেশের মঙ্গলের জন্য যদি আমার এ ভূঞাগিরি ত্যাগ করিতে হয়, তৎক্ষণাৎ করিব। অনর্থক, লোক-ক্ষয় হইতে দিব না।

৮

সাহবাজ খাঁর পরাজয়ের পরে দশবৎসর গত হইয়াছে। বাদশাহ এতদিন রাজপুতনা লইয়া বিব্রত ছিলেন, বাঙ্গালার দিকে দৃষ্টিকরিবার অবসর হয় নাই; কিন্তু ঈশাখাঁর কথা তাঁহার মনে ছিল। ক্ষুদ্র এক বাঙ্গালী ভূঞা ভাটীমুল্লুকে মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে. দিল্লীর বাদশাহ এ অপমান সহিতে পারিলেন না; দিগ্‌বিজয়ী রাজ মানসিংহকে ভৌমিক-দমনের জন্য বাঙ্গালার সুবেদার করিয়া পাঠাইলেন।

মানসিংহ বাঙ্গালায় আসিলেন, গৌড় ও তাণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া আগমহলে রাজধানী স্থাপন করিলেন; আগমহলের নাম হইল রাজমহল।

রাজধানী রাজমহল হইতে অশ্বারোহী, পদাতি, ও নাওরা লইয়া মানসিংহ ভৌমিক দমনের জন্য অভিযান করিলেন। অগ্রগামী 'নকীব' ও ভাটেরা গাইতে লাগিল ঃ—

"যাহার নামে ত্রিপুর মঘ
বাঙ্গালী আর উড়িয়া।
পাঠান, জাঠ, সকল বীর
দূর চলি যায় ভাগিয়া।
সমর রঙ্গে কাঁপিছে বঙ্গ
হয় গজ পদ ঘায়,
যুঝিতে এসেছে সমরসিংহ
সে মানসিংহ রায়।

এই গাথা শুনিয়া মানসিংহের নামেই অনেক ভৌমিক মস্তক অবনত করিলেন, বাদশাহকে কর দিতে বাধ্য হইলেন।

ঈশা খাঁ সংবাদ পাইলেন, মানসিংহ আসিতেছেন। সম্মুখ সমরে বিজয়ের আশা নাই বুঝিয়া ঈশা, সুবর্ণ-

গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া একডালা যাইবার আয়োজন করিলেন।

মানসিংহ ডেমরা গ্রামে শিবির স্থাপন করিয়া সুবর্ণ-গ্রাম আক্রমণ করিলেন। ঈশা খাঁ, যুদ্ধ করিলেন না, মোগলের সেনাপতিকে রাজধানী ছাড়িয়া দিয়া একডালা চলিয়া গেলেন। বিনাযুদ্ধে সুবর্ণগ্রাম মানসিংহের অধিকৃত হইল। কিন্তু রাজপুতবীর ইহাতে তুষ্ট হইলেন না। তিনি সুবর্ণগ্রাম লইতে আসেন নাই, বাদশাহ তাঁহাকে ঈশাখাঁর দমনের জন্য পাঠাইয়াছেন। কাজেই মানসিংহ সুবর্ণগ্রাম ছাড়িয়া একডালা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঈশাখাঁ সংবাদ পাইলেন, মানসিংহ একডালা অভিমুখে আসিতেছেন। বুঝিলেন, সোণারগাঁয়ের সুবর্ণশ্রী, রাজপুত সেনাপতিকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। ঈশা দেখিলেন, কৌশল ব্যর্থ হইল, যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। একডালার দুর্গে অল্প কয়েকজন গোলন্দাজ ও পদাতি রাখিয়া ঈশা সমস্ত সৈন্য সহ এগারসিন্দুরের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

মোগলের কামান একডালার দুর্গ-প্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। ঈশার গোলন্দাজগণও দুই চারিবার কামান দাগিল, কিন্তু যুদ্ধ করা তাহাদের

অভিপ্রেত নহে, কিছুকাল পরেই কামান ফেলিয়া তাহারা এগার-সিন্দুর অভিমুখে প্রস্থান করিল। মানসিংহ প্রাচীর ভগ্ন করিয়া একডালার দুর্গে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন দুর্গ—নীরব, জনপ্রাণি-হীন; রণ-সম্ভারের মধ্যে কয়েকটা ক্ষুদ্র কামান মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, আর কিছুই নাই। রাজপুতবীর, মোগল বাহিনীকে তখনই এগারসিন্দুর অভিমুখে 'কুচ' করিতে আদেশ করিলেন।

(৯)

এপারে এগারসিন্দুরের গগনস্পর্শী দুর্গ, ওপারে টোকের উন্নত প্রান্তর, মধ্যে ব্রহ্মপুত্র, গম্ভীর নাদে বহিয়া যাইতেছে।

দুর্গের শিখর দেশ হইতে ঈশাখাঁ দেখিলেন টোকের মালভূমিতে মোগল সেনাপতির শিবির স্থাপিত হইল। দলে দলে অশ্বারোহী, পদাতি ও গোলন্দাজ আসিয়া সেই বিস্তৃত প্রান্তর, ঢাকিয়া ফেলিল। যতদূর দেখা যায়, কেবলই মনুষ্যমস্তক,—কেবলই মোগলসৈন্য। ঈশাখাঁ দুর্গ প্রাকারে কামান শ্রেণী সাজাইয়া, হিন্দু ও পাঠান গোলন্দাজদিগকে উৎসাহিত করিয়া মন্ত্রণাগারে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। ঈশা খাঁ, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন মোগল সেনাপতি টোকে শিবির স্থাপন করিলেন, এখন কর্ত্তব্য কি?

মহবৎ খাঁ কহিলেন, আমরাই অগ্রে আক্রমণ করিব। পরিখা কাটিবার পূর্ব্বেই যদি আমরা আক্রমণ করিতে পারি, নিশ্চয়ই আমাদের জয় হইবে।

ঈশা—জয় হইবে বুঝিলাম। এই অগণিত দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত ও মোগলকে পরাজিত করিতে কি পরিমাণ সৈন্যক্ষয়ের সম্ভাবনা?

মহব্বৎ—তাহা ঠিক বলিতে পারিনা। তবে হতাহতের সংখ্যা যে অপরিমিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঈশা—খাঁ সাহেব, এত লোকের প্রাণ-বিনিময়ে কি লাভ হইবে?

মহব্বৎ— কেন, পাঠান-প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে।

ঈশা—ভুল বুঝিয়াছেন। একদল মোগলসৈন্য পরাজিত হইলেই পাঠান রাজত্ব স্থাপিত হইবে না। এক দল পরাজিত হইয়া দিল্লী যাইতে না যাইতেই তিনদল আসিয়া বাঙ্গালায় হাজির হইবে। সাহাবাজ গিয়াছেন মানসিংহ আসিয়াছেন। মানসিংহ যাইবেন, আবার

এক খাঁ-সাহেব কি সিংহজী আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এ হিন্দুস্থান মোগলের হইয়াছে। আমরা জন কয়েক হিন্দু ও পাঠান, এই ভাটী মুল্লুকে দাড়াইয়া দিল্লীর বাদশাহের প্রভুত্ব লোপ করিতে পারিব, ইহা অসম্ভব। রাজপুতেরা যাহা পারে নাই, বাঙ্গালীরা তাহা পারিবে এমন সম্ভাবনা নাই। সমুদ্রাভিমুখী গঙ্গার প্রবাহ হাতে ঠেলিয়া রোধ করা যায় না।

মহব্বৎ—তবে এতদিন রোধ করিতে চাহিতেছিলেন কেন?

ঈশা—এ ভাটী মুল্লুক অরাজক ছিল। দস্যু, তস্কর, মগ ও কোচে দেশ লুঠিতেছিল। এদিকে মোগল ও পাঠান, দিল্লীর সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিলেন, কেহই দেশরক্ষার কথা ভাবেন নাই, সকলেই আপনা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তাই, আমরা এ প্রদেশের রক্ষার ভার লইয়া ছিলাম।

মহব্বৎ—তবে সাহাবাজ খাঁ যখন আসিলেন, তখন তাহাকে চাকলার হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া মক্কা অভিমুখে গেলেই ত গোলমাল মিটিয়া যাইত। অনর্থক সে ভদ্র লোকটিকে তাড়াইয়া দিবার কি প্রয়োজন ছিল?

ঈশা—মহব্বৎ, বুঝিতে পার নাই। মোগলের সংখ্যা

কত, মোগল এ দেশ রক্ষা করিতে পারিবে কিনা, তাহা বুঝা একটা প্রয়োজন ছিল। আর একটি প্রয়োজন—আকবর, তৈমুরের মত দেশ লুঠিতে আসিয়াছেন, না দেশে সৌরাজ্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা জানা। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা; মোগল বাদশাহ বীর না হইলে দেশ রক্ষা করিতে পারিবেন না; সুতরাং তাঁহার বল বুদ্ধির পরীক্ষা প্রয়োজনীয় ছিল। এখন দেখিতেছি, দেশ লুণ্ঠন মোগলের অভিপ্রেত নহে। বাদশাহ আকবর সুশৃঙ্খল রাজ্য স্থাপন করিতেছেন। আরও দেখিতেছি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, এখন পাঠান বা হিন্দু এদেশে নাই।

মহব্বৎ—কেন? আকবরের বাহুতে কি দশ যোয়ানের বল? মোগলের অপেক্ষা পাঠান বোধহয় দুর্ব্বল নহে।

ঈশা—আকবরের বাহুর বল কত, জানি না। কিন্তু তাঁহার মনের বল যে অপরিমিত, তাহা বুঝিতেছি। সেই বলে আকবর সকল মোগল এক করিয়াছেন; রাজপুতেরা হিন্দু হইয়াও তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু দূরে যাউক, আমরা সকল পাঠানও এক করিতে পারি নাই, কখনও পারিব না।

আমরাই আমাদের শত্রু। তুমি দেখ নাই, মোগলের পক্ষেও অনেক পাঠান আছে। যুদ্ধ হইলে এখন পাঠানই পাঠানকে মারিবে, হিন্দুই হিন্দুর প্রাণ লইবে; বিধাতার ইচ্ছাতেই মোগল হিন্দুস্থানের বাদশাহ হইয়াছে। সে ইচ্ছার প্রতিরোধ করিবার শক্তি তোমার আমার নাই। অনর্থক লোকক্ষয় করিয়া দেশে অশান্তির আগুন জ্বালাইতে চাহিনা।

মহব্বৎ-- তবে কি করিতে চাহেন?

ঈশা—আমি মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিব। অনর্থক লোকক্ষয় করিব না। যদি আমি হারি, দেশ, মোগলের হইবে।

মহব্বৎ---আর মানসিংহ হারিলে?

ঈশা—তখন কি করিব বলিতে পারি না। তবে ইহা ঠিক, আমার জন্য দেশে অশান্তি ঘটিতে দিব না।

১০

পরদিন, ঈশাখাঁর পত্র লইয়া দূত, মানসিংহের শিবিরে গেল।

ঈশা লিখিয়াছেন—"রাজন্, আপনি আমাকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর বাদশাহের অধীন করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আপনার ও আমার বলের

পরীক্ষাই প্রয়োজনীয় ; অনর্থক লোকক্ষয় করিয়া কাজ নাই। আপনাকে আমি দ্বৈরথ সমরে আহ্বান করিতেছি। যদি আপনি জয়ী হন, এদেশ, বাদশাহের অধীন হইবে। আর যদি আপনি পরাজিত হন, শ্রান্ত সৈনিকেরা দিল্লী চলিয়া যাইবে। আপনি রাজপুতবীর, আশা করি, এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না।

মানসিংহ, ঈশাখাঁর পত্র পাঠ করিলেন ; পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলেন। কাবুল হইতে বাঙ্গালা মুল্লুকের মধ্যে তিনি কত দেশ জয় করিয়াছেন, কত বীর দেখিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে এমন কথা কখনও লিখে নাই ; এমন দেশপ্রীতি লোক-হিতৈষিতা ও ত্যাগের কথা, কোনও দেশাধিপতি বলেন নাই। রাজপুত মানসিংহ, বাঙ্গালী ঈশাখাঁর মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন—"খাঁ সাহেব, আপনার প্রস্তাব উত্তম। অদ্যই মধ্যাহ্নে সাক্ষাৎ ঘটিলে সুখী হইব।"

১১

এগার সিন্দুরের দুর্গের অনতিদূরে বিস্তৃত প্রান্তর। সেই প্রান্তর মধ্যে দুই কাতারে সৈনিকগণ দাঁড়াইয়াছে। সৈনিকেরা নিরস্ত্র ; আজ তাহারা দর্শক মাত্র। উভয়

সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে দুইজন অশ্বারোহী—ঈশা খাঁ ও মানসিংহ। উভয়ের যোদ্ধৃবেশ,—দক্ষিণ হস্তে তরবারী, বামহস্তে বর্শা ও ঢাল; দেহ বর্ম্মাবৃত। উভয়েরই তেজস্বী অশ্বদ্বয় চঞ্চল, আপনার তেজ যেন আপনি সহিতে পারিতেছে না।

অশ্বারোহী দুইজন চক্রাকারে একবার ঘুরিয়া উভয়ে উভয়কে অভিবাদন করিলেন। তাহার পর নক্ষত্র গতিতে একে অপরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই ক্ষিপ্রহস্ত ও সমরকুশল; উভয়েরই তরবারী বিদ্যুতের মত ঝলসিতেছে উঠিতেছে ও পড়িতেছে। দর্শকেরা স্পন্দহীন-নেত্রে চাহিয়া আছে, এমন সময়ে ঈশাখাঁর তরবারীর আঘাতে মানসিংহের তরবারী দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। মানসিংহ, বামহস্তের বর্শা, দক্ষিণ হস্তে লইয়া ক্ষিপ্র গতিতে প্রহার করিলেন কিন্তু ঈশার দুর্ভেদ্য ঢালে প্রহত হইয়া বর্শা, খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পড়িল। কাবুল বিজেতা, পাঁচহাজারী মনসবদার মানসিংহ, নিরস্ত্র হইয়া প্রমাদ গণিলেন। জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সেই মুহূর্ত্তে নির্ভীক রাজপুত বীরের হৃদয়ও এক-বার কম্পিত হইল। পলায়ন বা মৃত্যু—সম্মুখে এই দুই পথ। মানসিংহ, কোন পথে যাইবেন? পলায়ন করিলে

৩—

প্রাণ বাঁচিতে পারে কিন্তু রাজপুতের মান, বাদশাহের মান, মানসিংহের মান, বাঁচে না। মানসিংহ, পলাইতে পারিলেন না, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। সেই মুহূর্ত্তে ঈশা খাঁ উন্মুক্ত তরবারী উদ্যত করিয়া মানসিংহের দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। দর্শকেরা শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু মানসিংহ নিশ্চল; মৃত্যু সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয়; ঈশা, মানসিংহের নিকটে আসিয়া অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন, মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিলেন. তাঁহার উদ্যত তরবারী অবনত হইল। ঈশা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। তাহার পরে মানসিংহের দিকে তরবারীর মুষ্টি অগ্রসর করিয়া দিয়া কহিলেন. রাজপুত, আপনি নিরস্ত্র; অস্ত্রহীনের সহিত যুদ্ধ পাঠানের ধর্ম্ম নহে। আপনি এই তরবারী গ্রহণ করুন, আমি বর্শা লইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিব।

মানসিংহও অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তরবারী স্পর্শ না করিয়া ঈশাখাঁকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, পাঠানবীর, তোমার বাহুবলে মানসিংহ অস্ত্রহীন হইয়াছে, এবার হৃদয়ের বলে তাহাকে কিনিয়া লইলে। তোমার সহিত যুদ্ধ অসম্ভব। আমি তোমার বাহু ও হৃদয়, উভয়েরই নিকটে পরাজিত হইলাম। আজি

হইতে তুমি আমার বন্ধু। তোমার মত বীরের সহিত বিরোধ, দিল্লীশ্বরের বাঞ্ছনীয় নহে।

আলিঙ্গনবদ্ধ বীরদ্বয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া মোগল, পাঠান ও হিন্দু সৈনিকগণ, জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

১২

সেইদিন অপরাহ্নে মানসিংহ এগারসিন্দুর দুর্গে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

তখন ব্রহ্মপুত্রের শীত-সলিলস্নাত বাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছিল, সম্মুখে শষ্পাচ্ছাদিত প্রান্তর ভূমির শ্যাম সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, বনবিহঙ্গগুলি মধুর নাদে আপনার নীড় অভিমুখে উড়িয়া যাইতেছিল। প্রকৃতি শান্তিময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী, মনোরমা।

সেই স্নিগ্ধ প্রকৃতির দিকে চাহিয়া মধুর অপরাহ্নে দুর্গের উপরে দুই বন্ধু—ঈশাখাঁ ও মানসিংহ, আলাপ করিতেছিলেন। মানসিংহ কহিলেন—বন্ধু, তোমাকে আমার সহিত দিল্লী যাইতে হইবে।

ঈশা—কেন? মোগল বাদশাহের কারাগারে একটি পাঠান বন্দী বাড়াইবার জন্য কি?

মানসিংহ—বাদশাহের কারাগারে বন্দী প্রচুর আছে। সেজন্য তোমার প্রয়োজন নাই। তোমাকে, মোগল ও

পাঠানের মিলনের জন্য যাইতে হইবে। পাঠানের বাহুবল দিল্লীর বাদশাহের অপরিচিত নহে; তোমাকে পাইয়া বাদশাহ বুঝিবেন, পাঠানের হৃদয় আছে, আর সে হৃদয়, মহত্ত্ব ও ত্যাগে পরিপূর্ণ। বাহুবলে জয়ী হইয়া মোগল, পাঠানের শত্রু হইয়াছিল, এবার পাঠানের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার মিত্র হইবে।

ঈশা—এ ভাটীমুল্লুকের দুষমন্‌কে দেখিয়া বাদশাহ সুখী হইবেন কি?

মানসিংহ—আকবরের হৃদয়ে তেমন মহত্ত্ব না থাকিলে রাজপুতেরা তাঁহার আজ্ঞাধীন হইতনা।

ঈশা খাঁ দিল্লী যাইতে সম্মত হইলেন।

১৩

আগ্রার আম-দরবারে বাদশাহের আগমনের সময় হইয়াছে। সমাগত আমীর, মনসবদার, দর্শক, অর্থী,—সকলে চঞ্চল, সকলেই পথের দিকে চাহিয়া আছে। এমন সময়ে ‘নকীব’ বাদশাহের আগমন ঘোষণা করিল, দামামা বাজিয়া উঠিল, বাদশাহ ধীরে ধীরে আসিয়া রৌপ্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সকলে তছলিম করিল।

ক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী শান্ত হইলে, বাদশাহ, মানসিংহের দিকে চাহিলেন।

মানসিংহ, ঈশাখাঁকে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কহিলেন—জাঁহাপনা, ইহাঁরই নাম ঈশা খাঁ।

ঈশা খাঁ, বাদশাহকে তিনবার তছলিম করিয়া হাজার-এক 'আশরফি' নজর দিলেন।

বাদশাহ, প্রফুল্লমুখে সুবর্ণ মুদ্রাগুলি স্পর্শ করিয়া ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—পাঠানবীর, আমি আপনার বীরত্ব ও মহত্বের কথা, রাজার মুখে শুনিয়া তুষ্ট হইয়াছি।

ঈশা, দাঁড়াইয়াছিলেন, পুনরায় তছলিম করিলেন।

বাদশাহ বলিলেন—দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজা মানসিংহকে আহ্বান করিতে সাহস করে, হিন্দুস্থানে এমন কেহ আছে বলিয়া জানিতাম না। কিন্তু বীরত্ব অপেক্ষাও আপনার মহত্ব অধিকতর বিস্ময়কর। শত্রুকে মুষ্টির মধ্যে পাইয়াও যে, শত্রুতা ভুলিতে পারে, তাহার সহিত বিরোধ করা যায় না। আপনি স্বীয় মহত্বে মোগলের হৃদয় জয় করিয়াছেন। আপনাকে মোগল দরবারের ওমরাহ পদবী ও তিনহাজারী মনসব দিতেছি। আশাকরি রাজার ন্যায় আমাকেও আপনার বন্ধু বলিয়া মনে করিবেন।

ভাটীমুল্লুক আপনার শাসনে সুরক্ষিত হইতেছে, অবগত হইয়াছি। সরকার বাজুহা, সরকার সোণার গাঁ,

ও সরকার ঘোড়াঘাটের বাইশ পরগণা আপনার জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হইল।

বাদশাহের সদয় ব্যবহারে ঈশা খাঁ কৃতজ্ঞচিত্তে, পুনরায় তছলিম করিলেন।

পরদিন, বাইশ পরগণার জায়গীরের সনদ ও মসনদ-ই-আলি উপাধি লইয়া ঈশা খাঁ সুবর্ণগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মোগল পাঠানের মিলন হইল।

ঈশাখাঁ, আপনার প্রভুত্বের স্পৃহা বিসর্জ্জন দিয়া লোক হিতৈষিতা ও মহত্ত্বের জন্য অমর হইলেন।

অশোকের নবজীবন

১

"মন্ত্রী,"

"আদেশ করুন, মহারাজ।"

"তুমি শাস্ত্র মান?"

"মানি।"

"শাস্ত্রে নরক ভোগের কথা আছে, জান?"

"জানি, মহারাজ।"

"কিন্তু, সে নরকভোগ হয় কিনা কে জানে? আমি ইহলোকে দোষী দিগকে নরক ভোগ করাইব, শাস্ত্রানুসারে দণ্ড দিব। তুমি নরক নির্ম্মাণ কর। নরকে যেমন যেমন দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, এ নরকেও সে সমুদয়ই থাকিবে। সেই তীব্র নীলশিখাময় অগ্নি, সেই লৌহদংষ্ট্রাশালী বৃশ্চিক, তীব্র বিষধর, অগ্নিময় লৌহ পুরুষ ও লৌহস্ত্রী—সব থাকিবে। আমি ইহলোকেই মনুষ্যদিগকে নরক ভোগ করাইব। আর বন্দী করিয়া বা সোজা সোজা দণ্ড দিয়া আমার তৃপ্তি হয় না।"

আদেশ শুনিয়া মন্ত্রী শিহরিল ; প্রকাশ্যে বলিল—"মহারাজ, তাহাই হইবে।"

কেবল, তাহা হইলেই হইবে না। নরকের বহির্দ্দেশ এমন সুচিত্রিত, সুগঠিত ও সুনির্ম্মিত হইবে যে, এ ভুবনে উহার তুলনা থাকিবেনা। বাহির হইতে যে দেখিবে, সেই যেন, উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে। তুমি সত্বর হও, রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি।

২

সম্রাট অশোকের আদেশে পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদের অদূরে বিচিত্র নরক নির্ম্মিত হইল। কি সুন্দর প্রাসাদ! তাহার গঠনসৌন্দর্য্যে রাজপ্রাসাদও মলিন বোধ হইতে লাগিল।

নরকের অভ্যন্তরে প্রথমেই তরল অগ্নিময় বৈতরিণী, তাহার পরে নানা প্রকোষ্ঠে নানা বিচিত্র যন্ত্রণার আয়োজন। মানুষের কল্পনায় যন্ত্রণা ভোগের যত চিত্র কল্পিত হইতে পারে, তাহার একটিও বাকী রহিল না। জল্লাদ চণ্ডগিরিকের উপর নরকের ভার প্রদত্ত হইল।

দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত অপরাধিগণ সেই নরকে শাস্ত্রানুযায়ী বিচিত্র যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। কেহ তপ্ততৈলে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, কেহ নীলশিখ অগ্নিতে

দগ্ধ হইল, কেহ হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় লৌহদংষ্ট্রাবিশিষ্ট বৃশ্চিকের দংশনে চীৎকার করিতে লাগিল। নিষ্ঠুর চণ্ড-গিরিক, লৌহদণ্ড হাতে লইয়া যমদূতের ন্যায় মগধের প্রজাদিগকে নরক ভোগ করাইতে লাগিল। রাজ্যে হাহাকার উঠিল।

নৃপতি অশোক, সে চীৎকার ও হাহাকার শুনিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য নূতন প্রণালীর নরক যন্ত্রণা উদ্ভাবিত ও গঠিত হইতে লাগিল।

প্রথমে দোষীরা নরকে যাইতে লাগিল, তাহার পরে দোষী বলিয়া যাহাদিগকে সন্দেহ করা হইত, তাহারা গেল। শেষে আর দোষী নির্দ্দোষের ভেদ রহিল না। সেই নরকের আশ পাশে যাহাকে পাইত, চণ্ডগিরিকের অনুচরেরা তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া নরক ভোগ করাইতে লাগিল।

নরকের অট্টালিকা, মনোহর ; রাজপ্রাসাদ হইতেও মনোরম। মগধে, সেরূপ অট্টালিকা আর ছিল না। উহার শিল্পচাতুর্য্য দেখিবার জন্য অনেক বিদেশীয় লোক নিকটে আসিত। কিন্তু নিকটে আসিলেই তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইত, নরক ভুগিতে হইত। একবার প্রবেশ করিলে কেহ প্রাণ লইয়া বাহির হইত না।

৩

এক দিন এক ভিক্ষু, নরকের নিকট দিয়া যাইতে-ছিলেন। ভিক্ষুর মস্তক, মুণ্ডিত, পরিধান পীতবস্ত্র, হস্তে ভিক্ষাপাত্র। তাঁহার প্রশান্ত মুখ, মৈত্রী ও করুণামাখা। জীবের হিতের জন্য ভিক্ষুর শান্তোজ্জ্বল নয়ন হইতে করুণার জ্যোতি বাহির হইতেছিল।

সম্মুখে মনোহর প্রাসাদ, অপূর্ব্ব স্থাপত্যে গঠিত। ভিক্ষু, একবার দাঁড়াইয়া সেই অট্টালিকার সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন।

রক্তচক্ষু চণ্ডগিরিক দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া ডাকিয়া বলিল—খাড়া রহ। তাহার পরে নিকটে আসিয়া সেই সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর হাত ধরিল।

সন্ন্যাসী তেমনই শান্ত, তেমনই করুণাময় দৃষ্টিতে সেই যমদূতের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কল্যাণ হউক, কোথায় যাইতে হইবে, বাছা?

নরকে। তুমি নরকের পথে আসিয়াছ।

ভিক্ষু—এ যে রাজপ্রাসাদ; ইহাই কি নরক?

চণ্ড—হাঁ, ইহাই নরক। ভিতরে চল, দেখিতে পাইবে। এপথে আসিলে সকলকেই নরক ভোগ করিতে হয়। মহারাজের আদেশ।

ভিক্ষু—কল্যাণ হউক। চল যাই।

চণ্ডগিরিক, ভিক্ষুকে নরকে আনিয়া তপ্তৈতলের কটাহে ফেলিল। ভিক্ষু সেই কটাহে বসিয়া শান্তবদনে গাইতে লাগিলেন :—

"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি,
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

যমদূতেরা তাহাকে সেখান হইতে উঠাইয়া নীলশিখ অগ্নিতে ফেলিয়া দিল। ভিক্ষুর শীতলস্পর্শে আগুন নিভিয়া গেল। বহুদিনের তপ্ত সেই নরক যেন শীতল হইল।

ভয়ে ও বিস্ময়ে চণ্ডগিরিক, অশোকের নিকটে যাইয়া জানাইল—মহারাজ, কোথাকার একটা ভিক্ষুককে নরক ভোগ করাইতেছিলাম, কিন্তু সে ত নরক ভোগ করিলই না, অধিকন্তু এত যত্নে নির্ম্মিত নরকটিকে সে নষ্ট করিয়া ফেলিল।

অশোক—কিরূপে নষ্ট করিয়াছে?

চণ্ড—তাহাকে তপ্তৈতলে ফেলিয়াছিলাম, তৈলের মধ্যে বসিয়া সে কি গান করিল, আর তৈল ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তাহার পরে তাহাকে আগুনে ফেলিলাম,

আগুন নিভিয়া গেল। মহারাজ, সে হতভাগা, তপ্ত নরক একবারে ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিয়াছে। নরকে আর জ্বালা নাই।

বলিস্ কি ?

হাঁ মহারাজ, এইরূপই বটে।

চল্, আমি যাইব।

অশোক, চণ্ডগিরিককে লইয়া নরকে আসিলেন। ভিক্ষু, তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"সকলের কল্যাণ হউক ; জগতের মঙ্গল হউক।"

অশোক—তুমি কে ?

ভিক্ষু—আমি ভিক্ষু।

অশোক—তুমি আমার নরকের জ্বালা নিভাইয়াছ ?

ভিক্ষু—জ্বালা নিভাইবার আমার সাধ্য কি মহারাজ ? যিনি জীবের সকল দুঃখ জ্বালা নিভাইয়াছেন, সেই ভগবান্ তথাগতই আপনার নরকের জ্বালাও দূর করিয়াছেন। মঙ্গল হউক মহারাজ।

অশোক—মঙ্গল কে চাহে ভিক্ষু ? আমি চাই আনন্দ। মনুষ্যদিগকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করাইয়া আমি বড় আনন্দ পাইতাম। তুমি সে আনন্দে বাধা দিলে কেন ?

ভিক্ষু—মহারাজ, জীবের প্রতি করুণা করুন, উহা অপেক্ষা শতগুণ আনন্দ হইবে। ভগবান্ তথাগত, সর্ব্ব জীবে মৈত্রী ও করুণার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

ভিক্ষুর মুখ বড় শান্ত, বড়ই করুণা-মণ্ডিত। তাঁহার নয়ন হইতে করুণার ধারা ক্ষরিত হইতেছিল। ভিক্ষুর কথা শুনিয়া চণ্ড-অশোক কি ভাবিতে লাগিলেন। তাহার হৃদয়ে যেন ঝড় বহিল, সেই ঝটিকায় পাপের যত কল্পনা সবই যেন উলট্‌পালট্ করিয়া ফেলিল। অশোক, একবার চণ্ডগিরিকের মুখের দিকে, একবার ভিক্ষুর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। ভিক্ষুর বদন, কি শান্ত, কি মমতা-মাখা। এ যদি মানুষ, চণ্ডগিরিক যে, তাহাহইলে পশুরও অধম। হায়, হিংসায় –পরপীড়নের ইচ্ছায়—মানুষকে এমনই অধম করে! অমিও ত উহারই মত অধম হইয়াছি।

আপনার কার্য্যের জন্য অশোকের অনুতাপ জন্মিল। অপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে চণ্ডগিরিকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আর নরক চাই না; জগতে যন্ত্রণা আনিয়াছিলাম, জীবকে যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ পাইতাম, আর না। যদি পারি জীবের যন্ত্রণা দূর করিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। তুই, পাটলীপুত্র ছাড়িয়া চলিয়া যা।

৪

অশোক বলিলেন—ভিক্ষু, জীবের প্রতি মৈত্রী-করুণা আমার নাই। আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিয়াই আনন্দ পাইতাম। বলিতে পার কেন এমন হইয়াছিল?

ভিক্ষু বলিলেন—মহারাজ, তুমি জীবদিগকে তোমার মত বলিয়া কখনও ভাব নাই। তাহাদেরও যে একটা সুখ দুঃখ আছে এবং সে সুখ দুঃখ যে তোমারই মত, তাহা কখনও অনুভব কর নাই। তাই, জীবকে যন্ত্রণা দিয়া —বধ করিয়া—তোমার একটা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে। উহা একটা উত্তেজনা মাত্র, আনন্দ নহে। এখন জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা দেখাও, আনন্দ পাইবে. জগৎ সুখময় দেখিবে। সকলে তোমার আপন হইবে।

কিরূপে আমার প্রাণে মৈত্রী করুণা আসিবে, ভিক্ষু! আমি যে চণ্ডাশোক।

তুমি সকল জীবকে আপনার মত ভাব, তোমার মতই সকল জীবের সুখ দুঃখ আছে, অনুভব কর; তবেই সকলকে সুখী করিতে আকাঙ্ক্ষা হইবে; তোমার হৃদয়ে মৈত্রী-করুণা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। মহারাজ, যন্ত্রণার নরক গড়িয়াছিলে, এখন শান্তির স্বর্গ প্রতিষ্ঠা কর। তথাগত তোমাকে কৃপা করুন।

বলিতে বলিতে সেই মুণ্ডিতমস্তক শান্তশ্রী ভিক্ষু চলিয়া গেল।

৫

অশোকের হৃদয়ে ঝড় বহিয়াছিল, এবার বিদ্যুৎ চমকিল। অশোক দেখিলেন, সত্যই তিনি কোন জীবকে আপনার মত বলিয়া ভাবেন নাই। কাহারো প্রাণে যে, সুখ দুঃখ বোধ আছে, এ কথা তাঁহার মনে হয় নাই। সকলকে দুঃখ দিয়াছেন, কাহাকেও সুখী করেন নাই।

সম্মুখে নরকের আগুন তখনও জ্বলিতেছিল, অশোক সেই আগুনে হাত দিলেন, হাত জ্বলিয়া গেল। অশোক হাত টানিয়া লইয়া শিহরিয়া উঠিলেন, মনে হইল, হায়, কত লোককে এ জ্বালায় জ্বালাইয়াছি। তপ্ত তৈলে অঙ্গুলি দিলেন, অঙ্গুলি পুড়িয়া গেল; জ্বালায় অশোক অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন—হায়, আমারই মত অসংখ্য মানবকে এত জ্বালা দিয়াছি।

এবার অশোক, আপনার জ্বালা দিয়া পরের জ্বালা বুঝিলেন। জীবের প্রতি মৈত্রী আসিল, করুণা জন্মিল। কিরূপে জগতের দুঃখ দূর করিবেন, অশোক, তাহাই

ভাবিতে লাগিলেন। কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁহার চিত্ত, ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

৬

স্নিগ্ধ প্রভাতে শীতল বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছিল, উদ্যানের ফুলগুলি হইতে মধুরগন্ধ ছুটিতেছিল, উপবনে কলকণ্ঠ বিহঙ্গেরা মধুর স্বরে গাইতেছিল। জগৎ শান্ত, রমণীয়, করুণাময়।

এই সময়ে পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদের নিকট দিয়া এক সপ্তবর্ষীয় বালকভিক্ষু, ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া পীত বসন পরিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছিল :—

"অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনোপদং,
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথা মতা"

(অপ্রমাদ, অমৃতের পথ ; প্রমাদ, মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্ত, মরে না ; যাহারা প্রমত্ত, তাহারা মৃতের মত।)

নৃপতি অশোক, বাতায়ন পথ দিয়া রাজপথের দিকে চাহিয়াছিলেন। বালক ভিক্ষুর মধুর কণ্ঠে এই মধুর বাণী শুনিয়া তাঁহার চিত্ত অমৃতের পথ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

দেশ ও কালের একটা প্রভাব আছে। সেই মধুর প্রভাত, ভিক্ষু বালকের সেই শান্ত মধুর মূর্ত্তি, আর তাহার

সেই করুণামাখা কণ্ঠ, এসকলে মিলিয়া অশোককে যেন একবারে বিগলিত করিয়া ফেলিল।

অশোক, প্রহরীকে আদেশ করিলেন, ঐ যে রাজপথে মুণ্ডিতমস্তক বালকভিক্ষু যাইতেছে, উহাকে আমার নিকট লইয়া আয়।

প্রহরী, বালককে লইয়া আসিল। "জগতের কল্যাণ হউক" বলিয়া ভিক্ষুবালক, সম্রাটের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

অশোক বলিলেন, ভিক্ষু, তুমি রাজপথে কি গাহিতেছিলে, আবার গাও।

বালক গাইল—"অপ্রমাদ, অমৃতের পথ।

অশোক বলিলেন—বলিতে পার, এ অমৃতের পথে কিরূপে যাওয়া যায়?

বালক—জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা করিয়া; জগতের কল্যাণ চাহিয়া। মহারাজ, আমি বালক, আপনাকে কি বলিব? স্থবির উপগুপ্তকে আনয়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করুন, তিনি অমৃতের পথ দেখাইবেন।

উপগুপ্ত কোথায়?

তিনি মথুরায় থাকেন।

ভিক্ষু, বালক, বিদায় হইল।

৮

সেইদিন অশোক, স্থবির উপগুপ্তকে আনিবার জন্য বিনয়পূর্ণ পত্রীসহ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে মথুরায় পাঠাইলেন।

উপগুপ্ত আসিলেন। তাঁহার শান্ত ও পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া অশোকের মনে হইল আমি এই পৃথিবীতে নরক গড়িতে গিয়াছিলাম, তথাগতের উপদেশে স্বর্গ গঠিত হইয়াছে। এই স্থবিরেরা সেই স্বর্গের দেবতা।

অশোক, উপগুপ্তের পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন.—আমাকে অমৃতের পথ দেখাইয়া দিন্। আমি মানবের যন্ত্রণার জন্য নরক গড়িয়াছিলাম, আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান করুন।

উপগুপ্ত কহিলেন—মহারাজ, জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণাই অমৃতের পথ। ইহাই মানুষকে মঙ্গল প্রদান করে। এই মৈত্রী ও করুণার বিস্তারেই আপনার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আসুন, আপনাকে তথাগতের প্রীতির ধর্ম্মে দীক্ষিত করি। বলুন ঃ—

ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

সকল প্রাণীকে নিরুদ্বেগ ও সুখী করুন। তথাগতের

উপদেশ, জগতে প্রচার করুন, আপনি অমর হইবেন, আপনার সকল কলঙ্ক মুছিয়া যাইবে।

উপগুপ্তের দীক্ষায়, অশোক, নবজীবন লাভ করিলেন।

সেইদিন, ইতিহাসের স্মরণীয় দিন, জগতের স্মরণীয় দিন। সেদিন, সম্রাট অশোকের হৃদয় হইতে করুণা-মৈত্রীর যে অমৃতধারা প্রবাহিত হইল, উহা বহুকাল ব্যাপিয়া ভারতে জীবের যন্ত্রণা দূর করিয়া অশোককে অমরত্ব প্রদান করিল।

চন্দ্রদ্বীপ

১

যখন "গর্গ যবনান্বয় প্রতাপ কালরুদ্র" মহারাজ দনুজ মাধব সেন, সুবর্ণ গ্রামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বঙ্গভূমে পাঠান-প্রবেশের প্রতিরোধ করিতেছিলেন, সেই সময় বিক্রমপুরে চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।

চন্দ্রশেখর, অশেষ শাস্ত্রদর্শী এবং নিষ্ঠাবান্ শক্তিসাধক ছিলেন। তাঁহার উন্নত গৌরদেহ, সুবিস্তৃত ললাট, ও উজ্জ্বল নেত্র যে দেখিত সেই তাহাকে সম্ভ্রম না করিয়া পারিত না।

মহারাজ দনুজমাধব, চন্দ্রশেখর ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

সুবর্ণগ্রাম সেন রাজগণের রাজধানী হইলেও বিক্রম-পুরে তাঁহাদিগের এক বিস্তৃত প্রাসাদ ছিল। পল্লী-নিবাসের সুখ অনুভব করিতে কখন কখন দনুজমাধব এই প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতেন। গুরুর সান্নিধ্য লাভে এবং সাধনতত্ত্বের, আলোচনায় তাঁহার এই পল্লীবাসের দিন সুখে যাইত।

সেই রাজপ্রাসাদে এক দিন গুরুশিষ্যে—চন্দ্রশেখর ও দনুজমাধবে—বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। চন্দ্রশেখর বলিলেন, বৎস, যে মহাশক্তি হইতে এ বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, আমরা তাঁহাকে মা বলি। তিনি তোমার মা, আমার মা, কীট পতঙ্গ জড় চেতন সকলের মা, সকলের প্রসূতি। যখন এ জগৎ ছিলনা, তখন কেবলই তিনি ছিলেন, যখন এ জগৎ থাকিবে না, তখনও কেবল তিনিই থাকিবেন। তিনিই এ বিশ্ব সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই সংহার করেন, তাঁহাতে উৎপত্তি, তাঁহাতেই লয়। আমরা মায়ের মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহার এ প্রসূতি ও সংহর্ত্রী দুই রূপ বুঝিতে চেষ্টা করি। তাই, মায়ের মূর্ত্তি যেমন স্নেহময়ী, আনন্দময়ী ও কল্যাণময়ী, তেমনই ভীমা, অসি-খর্পরধারিণী মুণ্ডমালিনী; মা আপনার সন্তানের রক্ত, আপনি পান করিয়া রুদ্রতালে নাচিতেছেন। তাঁহার পদভরে বিশ্বের প্রলয় হইতেছে, আবার তাঁহারই স্নিগ্ধ-হাস্যে বিশ্বের বিকাশ ঘটিতেছে। সৃষ্টি ও প্রলয়—উৎপত্তি ও বিনাশ, মায়ের লীলা, মহাশক্তির ক্রীড়া।

রাজা—মা, যদি জননী, তবে তিনি সন্তানের রক্ত পান করেন কেন? মায়ের গলে মুণ্ডমালা, এ কেমন মা প্রভু?

চন্দ্রশেখর—বুঝিতেছ না? মা যদি কেবলই জননী হইতেন, এ বিশ্বে কেবলই সৃষ্টি থাকিত, বিনাশ না হইত, তাহা হইলে জীবের দুঃখের অবধি থাকিত না। বিশ্ব, আনন্দহীন ও পুরাতন হইয়া পড়িত। সেই পুরাতন বিশ্বে যুগ যুগান্তরের পুরাতন জীব দুঃখে ব্যাকুল হইয়া কেবলই হাহাকার করিত। তাই মা, জননী হইয়াও সংহারিণী! সন্তানের রক্তধারায় রঞ্জিত হইয়া মা, বিশ্বে আনন্দধারা প্রবাহিত রাখিয়াছেন; জগৎ নিত্য নবীন করিয়া গড়িতেছেন। বাছা, মহাশক্তি সর্ব্বমঙ্গলা; তাঁহার সৃষ্টি জীবের মঙ্গলের জন্য, বিনাশও মঙ্গলের জন্য।

বলিতে বলিতে ভাবাবেশে চন্দ্রশেখর গাইতে লাগিলেন।

"ওমা সর্ব্বমঙ্গলে!
এরূপ কি ছলে?
জননী রূপেতে তারা সৃজি বিশ্ব চরাচর,
বধিতে সন্তানে মাগো ধরেছ অসি-খর্পর,
অট্টহাসি মুক্তকেশী নৃমুণ্ড গলে।
অভয়-বরদা শ্যামা, তুই কেন মা শবের পরে?
ও কি নৃত্য, পায়ের ভরে ধরা যে টলমল করে,
মহারৌদ্রী, নয়নে তোর কালাগ্নি জ্বলে।

তুই কেমন মা, বুঝলেম না মা, বুঝলেম না তোর একি খেলা

(দেখি) তোর ভাঙ্গা গড়ায় নূতন হয়ে ফুটে উঠে বিশ্বের মেলা,

(তাই) আনন্দের স্রোত অটুট থাকে, জীবের মঙ্গলে ॥"

গাইতে গাইতে চন্দ্রশেখরের অশ্রু পাত হইল। রাজা, তন্ময় হইলেন।

কিছু কাল পরে রাজা কহিলেন, বুঝিলাম প্রভু। মা কেন নৃমুণ্ডমালিনী। মায়ের গলায় মুণ্ডমালা না থাকিলে, বিশ্ব রসহীন ও পুরাতন হইয়া যাইত। মা কে কি বলিয়া ডাকিব প্রভু?

মা, বলিয়া ডাক; মহাশক্তি বল। আরও কিছু বলিতে চাও সর্ব্বমঙ্গলা বল। আমি এই নামেই ডাকি।

২

সেই দিন সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া চন্দ্রশেখর রুদ্রাণীর রূপ ধ্যান করিলেন। মায়ের রুদ্র-মঙ্গল মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বিশ্বের আদ্যন্ত মঙ্গল দেখিয়া ভক্তিভরে চন্দ্রশেখর ডাকিলেন—সর্ব্বমঙ্গলা, কোথায় তুমি সর্ব্বমঙ্গলা—

চন্দ্রশেখরের পত্নীর নাম ছিল সর্ব্বমঙ্গলা। গৃহে আর

কেহ ছিলনা, কেবল ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী। চন্দ্রশেখর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ডাকিতেছিলেন সর্ব্বমঙ্গলা ; সে ডাক শুনিয়া ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি মণ্ডপের দ্বারে যাইয়া বলিলেন "কি ঠাকুর, কেন ডাকিতেছ ? এই যে আমি। বল, কি করিতে হইবে ? তোমার ডাকে রান্না করা দায়, কেবলই ডাকা ডাকি।

চন্দ্রশেখরের 'অর্দ্ধবাহ্য' অবস্থা ; ভাবাবেশ তখনও আছে। বলিলেন "কে তুমি ?,,

"আমি সর্ব্বমঙ্গলা।,,.

চন্দ্রশেখর চমকিত হইয়া বলিলেন—তুমি সর্ব্বমঙ্গলা ?

"হাঁ ঠাকুর, আমিই তোমার সর্ব্বমঙ্গলা।"

"তাইত। আমি ত তোমায় ডাকি নাই।"

"একি রহস্য ? এই না এত ডাকাডাকি করিলে ?"

"ডাকিয়াছি ?—না, ডাকি নাই।"

"এই না ডাকিলে ? না ডাকিয়া থাক, আমি যাই।"

"যাও।"

"যাই, আর ডাকিলেও আসিবনা।"

গৃহিণী সর্ব্বমঙ্গলা চলিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—একি, ঠাকুরের হইয়াছে কি ?

পত্নী চলিয়া গেলেন। চন্দ্রশেখরের ভাবাবেশ তখন

ছুটিয়া গিয়াছে, কি করিলাম বলিয়া চন্দ্রশেখর দন্তে জিহ্বা দংশন করিলেন। তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন—পত্নীর নাম ধরিয়া মাকে ডাকিয়াছি, ছি ছি কি করিয়াছি। আমি ডাকিতেছিলাম মা সর্ব্বমঙ্গলা ; সেই ডাকে সর্ব্বমঙ্গলা আসিয়া উপস্থিত। আমি কি তবে সর্ব্বমঙ্গলাকে বলিলাম মা, আর জগন্মা-তাকে বলিলাম সর্ব্বমঙ্গলা? করিলাম কি? আমার এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তও বুঝি নাই।

চন্দ্রশেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। দ্রুতপদে প্রতিবেশী সার্ব্বভৌম ঠাকুরের বাড়ী গেলেন। সার্ব্বভৌম, প্রধান স্মার্ত্ত।

চন্দ্রশেখর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—সার্ব্বভৌম খুড়া, এ দিকে এস, এখনই একটা ব্যবস্থা দিতে হইবে। পাতির কথায়—পণ্ডিতের বড় আনন্দ; বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম, তাড়াতাড়ি বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। কিন্তু ও হরি, চন্দ্রশেখর যে একা দাঁড়াইয়া, যে পাতি নিবে সে কই? সার্ব্বভৌম, একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন,কিসের ব্যবস্থা বাবা?

চন্দ্রশেখর—যদি কেহ জগজ্জননীকে আপনার স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকে, এবং পত্নীকে 'মা' বলে তাহার কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে?

প্রশ্ন শুনিয়া সার্ব্বভৌমের শরীর জ্বলিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলেন—নির্ব্বংশের বেটা, এই তোর ব্যবস্থার কথা? যা স্মৃতিতে নাই, পুরাণে নাই, সেই ফাঁকি করিতে আসিয়াছেন। কি করা যায়, বেটাকে একটা উত্তর ত দিতেই হইবে। কি জানি যদি রাজার সভাতেই এ সকল প্রশ্ন উঠিয়া থাকে? উত্তর না দিলে সেখানে বৃত্তি বন্ধ হওয়াও অসম্ভব নয়। বেটা যে আবার রাজ-গুরু। কি করা যায়?

সার্ব্বভৌমকে নিরুত্তর দেখিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন,—কেন খুড়া বল না, উহার প্রায়শ্চিত্তের বিধিটা কি?

"বল্‌ছি বাপু; তুমি ত আর যেমন তেমন নও, অত বড় একটা তার্কিক। তোমাকে একটা কথা বল্‌তে একটু ভেবে চিন্তে বল্‌তে হয়। আর পূর্ব্বপক্ষও হতেছে একটা বড় রকম ফাঁকি।"

"না না খুড়া, আমি ফাঁকি কর্‌তে আসি নাই। তোমাকে সত্য সত্যই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

"তা ঠিক। তোমার মত অত বড় নৈয়ায়িক কি স্মৃতির ফাঁকি কর্‌তে আসে? তবে কি না, তাত জানই বাপু, সকল শাস্ত্রের মত এক নয়—'নাসৌ মুনির্যস্য'। তবে 'কলৌ পরাশরাঃ' একটা কথা আছে। তা, পরাশরের

মতেই একটা সমন্বয় করে বল্‌ছি, এ মহাপাতকের ব্যবস্থা স্মৃতিতে বড় একটা স্পষ্ট রকম কিছু নাই। যার ব্যবস্থা স্মৃতিতে নাই, তাতে দেহত্যাগই ব্যবস্থা। সকল পাপের বালাই ওতে কেটে যায়। তুমি কি বল?

চন্দ্রশেখর আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম ডাকিলেন—বাপু, পুরাণে আরও কিছু লিখে। কিন্তু সে কথা শুনিবার জন্য কেহ দাঁড়াইল না।

৩

যাইতে যাইতে চন্দ্রশেখর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

তখন নীলসিন্ধু ধবলফেণমালায় বিক্রমপুরের দক্ষিণ প্রান্ত সাজাইয়া দিত। চন্দ্রশেখর সমুদ্রের উপকূলে যাইয়া বসিলেন; বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

সম্মুখে অনন্ত বিস্তার শ্বেতফেণমণ্ডিত নীলসমুদ্র, উপরে উজ্জ্বল নক্ষত্র খচিত অসীম নীলাকাশ। দুই-ই নীল, দুই-ই অনন্ত। এই দুই অনন্ত শ্যামরূপ দেখিয়া অনন্ত শ্যামা জগন্মাতার মূর্ত্তি চন্দ্রশেখরের মনে উদয় হইল। চন্দ্রশেখর করযোড়ে বলিলেন, হায় মা এক

ক্ষুদ্রার নামে তোমায় ডাকিয়া যে মহাপাতক করিয়াছি, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। .

" কিন্তু আত্মহত্যাও যে মহাপাপ। এক মহাপাপে আর এক মহাপাতক খণ্ডে কি ?—চন্দ্রশেখর ভাবিতে লাগিলেন। শেষে স্থির করিলেন—"না, আপনি আত্ম-ঘাত করিব না। দৈবে হইতে পারে, এমন উপায় করি।,,

সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ছিল, চন্দ্রশেখর উহাতে আরোহণ করিয়া বন্ধন রজ্জু খুলিয়া দিলেন। গভীর জলে যাইয়া তরঙ্গাঘাতে নৌকা ডুবিবে,—এই আশা।

চন্দ্রশেখর ভাসিয়া চলিলেন। অনেক দূর গেলেন, কিন্তু নৌকা ডুবিল না। তাহার ক্ষুদ্র তরণী, তরঙ্গে তরঙ্গে রাজহংসীর ন্যায় নাচিয়া চলিল। সারারাত্রি এই ভাবে গেল। যখন প্রভাত হইল, সাগরের নীল সলিল রাশির মধ্য হইতে রক্তবর্ণ সবিতা দেখা দিলেন, তখন চন্দ্রশেখর দেখিলেন—চারিদিকে কোথায়ও স্থলের চিহ্ন নাই, যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলই নীল জল, কেবলই তরঙ্গের পর তরঙ্গ, ফেণপুঞ্জের পর ফেণপুঞ্জ। তাঁহার ক্ষুদ্র নৌকা দোলে, নাচে, কিন্তু ডুবে না।

মরণের দেশে আসিয়াও মৃত্যু হয়না দেখিয়া চন্দ্র-

শেখরের বিস্ময় জন্মিল। এমন সময়ে দেখিলেন—দূরে মোচার খোলার মত একখানি ক্ষুদ্র নৌকা; এক রূপসী তরুণী, উহাতে বসিয়া বসিয়া ক্ষেপণী সঞ্চালন করিতে করিতে তাঁহার দিকে আসিতেছে। বিস্মিত চন্দ্রশেখরের বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। চতুর্দ্দিকে অনন্ত প্রসারিত সীমাহীন জলরাশি,কোথাও তীরের চিহ্নমাত্র নাই, এ অনন্ত জলধিবক্ষে এ কি দৃশ্য! চন্দ্রশেখর, নিস্পন্দনেত্রে তরুণীর ক্ষেপণী সঞ্চালন দেখিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে রূপসী নিকটে আসিল। মৃদু হাসিয়া কহিল, ঠাকুর, কি দেখিতেছ? আমি জেলের মেয়ে, এমন করিয়া রোজই এ সাগরে যাতায়াত করি। তুমি কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছ? কেন যাইতেছ?

সেই জনহীন অপার জলধিবক্ষে তরুণীকে দেখিয়া চন্দ্র-শেখর কেবলই চাহিয়াছিলেন, কেবলই দেখিতেছিলেন। এতক্ষণে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। কহিলেন—"কোথায় যাইতেছি, জানিনা। কেন যাইতেছি, তাহা বলিবার নহে।„

"জাননা তবু যাইতেছ; তুমিই না পণ্ডিত? তুমি যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে ঠাকুর?

কেন যাইতেছ, বলিতে পার না। বুঝিলাম ওটা

পাপের কথা। নহিলে বলিতে পারিতে। তুমি পণ্ডিত হইয়াও জানিয়া পাপ করিতেছ। ·

ঠাকুর, তোমার ভুল হইয়াছে। সে সর্ব্বমঙ্গলা সত্যই সর্ব্বমঙ্গলা। তুমি ডাকিয়াছিলে, তাই সে আসিয়াছিল। ডাক নাই বলিলে কেন? তুমি পণ্ডিত হইয়াও 'জননী' আর 'জায়া' বুঝিতে পারিলেনা?

শোন ব্রাহ্মণ, যত নারী দেখ, সবই সেই জগন্মাতার অংশ। তিনিই মাতৃরূপে প্রসব করেন, পত্নীরূপে সেবা করেন, কন্যারূপে আনন্দদায়িনী নন্দিনী হন। নারী, অমূর্ত্ত মহাশক্তির মূর্ত্তি—জগতের জননী, বিশ্বের জায়া। তোমার সর্ব্বমঙ্গলাই সর্ব্বমঙ্গলা। ঘরে ফিরিয়া যাও। সর্ব্বমঙ্গলাকে ডাকিয়া তোমার পাপ হয় নাই।

এই যে সমুদ্র দেখিতেছ, ইহা অচিরাৎ স্থলে পরিণত হইবে। তুমি এখানে মনুষ্য নিবাস স্থাপন করিয়া স্বীয় নামে এ স্থানের নাম রাখিও।,,

মন্ত্রমুগ্ধের মত চন্দ্রশেখর তরুণীর কথা শুনিতেছিলেন, আর আপনার ভুলের কথা ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে সে রূপসীও নাই, সে তরণীও নাই। নীল সিন্ধুর অগণিত তরঙ্গ শোঁ শোঁ করিয়া কোথায় চলিয়াছে। চন্দ্রশেখর ব্যাকুলচিত্তে চারিদিকে

চাহিলেন, কোথাও সে তরণীর চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। তখন মুগ্ধ ব্রাহ্মণ, আকুলকণ্ঠে করযোড়ে কহিলেন—"বুঝিলাম মা, অবোধ সন্তানকে প্রবোধ দিতে আসিয়া এ ছলনা করিলে।"

তরঙ্গে তরঙ্গে ও অনুকূল বাতাসে চন্দ্রশেখরের নৌকা তীরে লইয়া আসিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রাম ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, ঘরে ঘরে আরতির শঙ্খ বাজিতেছে।

চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে ডাকিলেন—সর্ব্বমঙ্গলা,—কেহ উত্তর দিল না। আবার ডাকিলেন—সর্ব্বমঙ্গলা; আকুল কণ্ঠে,—প্রেমভক্তিস্নেহের কণ্ঠে ডাকিলেন—সর্ব্বমঙ্গলা। এবার যাঁহার ডাক, তাঁহার কাছে পঁহুছিল।

চণ্ডীমণ্ডপ হইতে চন্দ্রশেখর চলিয়া গেলে গৃহিণী কিছুকাল পরে সে ঘরে আসিয়া দেখিলেন, মণ্ডপ—আঁধার, ঠাকুর নাই। ভাবিলেন, কোনও প্রতিবেশীর বাড়ী গিয়াছেন, এখনই আসিবেন।

রাত্রির প্রহর গত হইল চন্দ্রশেখর আসিলেন না। সর্ব্বমঙ্গলা, অন্নের থালার পাশে বসিয়া রহিলেন। দুই প্রহর গত হইল, ঘরের চালে পেঁচা ডাকিতে লাগিল। সর্ব্বমঙ্গলা, একবার বাহিরের দিকে চাহিলেন, কই

কেউ ত আসে না। বাহিরে ঘোর অন্ধকার। সর্ব্বমঙ্গলা আঁচল পাতিয়া ভাতের থালার পাশে মেঝেয় পড়িয়া রহিলেন।

প্রভাত হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ উঠিলেন না। দিন গেল আবার সন্ধ্যা হইল, তবু উঠিলেন না। সর্ব্বমঙ্গলা, মনে মনে কেবলই বলিতে লাগিলেন—তুমি এস, তুমি না আসিলে আর উঠিব না। বুঝিয়াছি, তুমি কোন ভুলে পড়িয়াছ। যদি সতী মায়ের মেয়ে হইয়া থাকি, তোমার ভুল ভাঙ্গিবে, তুমি আসিবে। যেমন গিয়াছিলে তেমনই আসিবে।

সর্ব্বমঙ্গলা চক্ষু মুঁদিয়া কেবলই স্বামীকে ভাবিতে ছিলেন। সহসা চন্দ্রশেখরের ডাক তাঁহার কাণে গেল। তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। চন্দ্রশেখর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সর্ব্বমঙ্গলাকে দেখিয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিলেন—তোমায় এত ডাকিতেছি, উত্তর দেও না?

"কেন ঠাকুর, তুমি ত আমায় ডাক নাই বলিয়াছ।"

না—না, সর্ব্বমঙ্গলা উহা আমার ভুল। আমি তোমাকেই ডাকিয়াছি। তুমিই আমার সর্ব্বমঙ্গলা।

গৃহে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন—মেঝেয়, অন্নের থালা, জলের পাত্র, বসিবার পীঠ। আহারের সব

আয়োজন প্রস্তুত। কিন্তু এ অন্ন যে আজিকার নহে। চন্দ্রশেখর কহিলেন—সর্ব্বমঙ্গলা, এ কি ?

"তোমার জন্যই ঠাঁই করিয়া রাখিয়াছি ?"

"আজ ?"

"না।"

"কাল ?"

"তাই—ই"

"তুমি আহার কর নাই ?"

"তুমি যে অভুক্ত।"

চন্দ্রশেখর নীরবে ভাবিতে লাগিলেন—এ যে জায়ার ভক্তি, মায়ের মায়া এক ঠাঁই। জায়া না জননী!

৪

সেই রাত্রিতে রাজা দনুজমাধব স্বপ্ন দেখিলেনঃ—

অপরাহ্ন ; সহসা পশ্চিমাকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। দেখিতে দেখিতে মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল, ঘোর অন্ধকারে চারিদিক আবৃত করিল। সে আঁধার যেন প্রলয়ের মরণ ; উহা ঘন হইয়া ক্রমেই পূর্ব্বদিকে আসিতে লাগিল। চারিদিকে রব উঠিল—পলাও, পলাও ; যে, যে দিকে পার পলাও। কিন্তু দিক্ দেশের ঠিকানা নাই কে কোথায় পলাইবে ? দনুজমাধব, সিংহাসনে বসিয়া

ছিলেন, সে সিংহাসন কাঁপিতে লাগিল। আঁধার আসিয়া রাজপুরী ঢাকিল, সিংহাসন ঢাকিল। দনুজ-মাধব উচ্চঃস্বরে ডাকিলেন, কে কোথায় আছ? কেহ উত্তর দিল না। এমন সময়ে এক রজতপর্ব্বততুল্য পুরুষ, সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে আসিয়া বলিলেন,—রাজা, শীঘ্র পলাও, আর বিলম্ব করিও না। দক্ষিণ দিকে তোমার জন্য সৈকতভূমি রচিত হইয়াছে, তোমার গুরুকে লইয়া সে দ্বীপভূমে গমন কর।

স্বপ্ন দেখিয়া রাজা শিহরিয়া উঠিলেন, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রাণীকে বলিলেন,—সুমতি, ভীষণ স্বপ্ন দেখিলাম। এ দেশ হইতে রাজপাট উঠাইতে হইবে।

"কোথায় যাইবেন?"

"দক্ষিণে—সমুদ্র মধ্যে দ্বীপভূমিতে।"

"কে বলিল?"

"এক রজতশুভ্রপুরুষ, এই মাত্র স্বপ্নে বলিলেন। এ দেশে থাকিলে মঙ্গল হইবেনা।"

"স্বপ্ন কি সত্য হয়?"

"জানিনা। দেখি, গুরুদেব কি বলেন।"

৫

প্রাতে চন্দ্রশেখর রাজবাটীতে আসিলেন। দনুজমাধব

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রাত্রির স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ স্বপ্নের অর্থ কি প্রভু?

চন্দ্রশেখর বলিলেন—ইহা স্বপ্ন নহে, সত্য বলিয়াই বুঝিতেছি। আমি কোন ভ্রমে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে সমুদ্র মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছিলাম। সেখানে মা আমাকে জেলের মেয়ের বেশে দেখা দিয়া কাল এইরূপই বলিয়াছেন। চল যাই, দেখি, সমুদ্রমধ্যে সৈকতভূমি দেখা যায় কিনা, তাহাহইলেই স্বপ্নের কথা বুঝা যাইবে।

গুরু ও শিষ্য, সমুদ্রের দিকে চলিলেন। তাঁহারা উপকূলে যাইয়া দেখিলেন, সমুদ্র বহুদূর সরিয়া গিয়াছে। সাগরের নীলজলের পরিবর্তে শুভ্র বালুকারাশি সূর্য্যকিরণে যেন হাসিতেছে। সেই সৈকতভূমি অসীম, যতদূর দেখা যায়, তাহারা চাহিয়া দেখিলেন, কেবলই বালুকা।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, রাজা, মায়ের আদেশে এ দ্বীপ-ভূমির নাম চন্দ্রদ্বীপ হইল। এস, তোমাকে এই মাতৃ-ভূমির রাজপদে অভিষেক করি।

বালুকা রাশির উপর দিয়া উভয়ে সাগরের দিকে চলিলেন। পথ আর ফুরায় না; সাগর অনেক দূরে গিয়াছে। দিন অবসান হইয়া গেল। সন্ধ্যাকালে তাঁহারা নূতন উপকূলে উপস্থিত হইলেন।

৫—

চন্দ্রশেখর বলিলেন, রাজা স্নান করিয়া আইস। এই পবিত্র সাগর-সলিলে মায়ের নাম লইয়া ডুব দাও। মা, এ ভূমির অধিষ্ঠাত্রী, তোমাকে সিংহাসনে বসাইবার পূর্ব্বে মাতৃমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সে মূর্ত্তি, এই পবিত্র জলে আছে, তুলিয়া লও।

রাজা, ডুব দিলেন। একমূর্ত্তি হস্তে লইয়া উঠিলেন। সে মূর্ত্তি, সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী। কেশরী-কুঞ্জর বিমর্দ্দিত করিয়া মা, ধরণীকে মনুষ্য বাসের যোগ্য করিতেছেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, রাজা, এ মায়ের মূর্ত্তিই বটে কিন্তু এ যুগের নয়। তুমি আবার ডুব দাও।

রাজা, আবার ডুব দিলেন, এবারও এক মূর্ত্তি লইয়া উঠিলেন। এ মূর্ত্তি, মহিষমর্দ্দিনী, অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ নর, মায়ের পদতলে বিমর্দ্দিত হইতেছে। চন্দ্রশেখর বলিলেন রাজা, এ যুগও চলিয়া গিয়াছে. এ মূর্ত্তির প্রয়োজন নাই। আবার ডুব দাও।

রাজা ডুব দিয়া আর এক মূর্ত্তি লইয়া উঠিলেন। এ মূর্ত্তি অসুরনাশিনী; ক্রোধোন্মত্ত মাংসরক্তভোজী, সুরাপায়ী, রক্তচক্ষু, পাপাসক্ত অসুর মায়ের শূলে বিদ্ধ ও নাগপাশে বদ্ধ হইতেছে। চন্দ্রশেখর বলিলেন, রাজা, এ যুগও নাই। শরীরের বলে জগৎ জয় করিয়া কেবলই

যাহারা আপনার দেহের লালসা মিটাইত, সেই অসুর দল, মায়ের শূলে বিদ্ধ হইয়াছে। এ যুগ নাই, রাজা এখন মায়ের প্রতিষ্ঠা জ্ঞানে, প্রেমে ও শান্তিতে হইবে। এ যুগে মা, মহালক্ষ্মী—সর্ব্বৈশ্বর্য্যমণ্ডিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভূষিতা। তাঁহার নয়নে শান্তি ও করুণা, হস্তে বর ও অভয়, মুখে সন্তানের প্রতি—সর্ব্বজীবের প্রতি কেবলই মায়া। তোমাকে সেই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আবার ডুব দাও।

রাজা বলিলেন,—প্রভু আর পারি না। লোণা জলে কণ্ঠ তিক্ত হইয়া গিয়াছে।

চন্দ্রশেখর বলিলেন—বুঝিলাম, শরীরের বল পর্য্যন্তই তোমার অধিকার। জ্ঞান ও প্রেমের যুগ তোমার নয়। মায়ের সে মূর্ত্তি—জ্ঞান, প্রেম ও দয়ার মূর্ত্তি—সাগর হইতে আসিবে, কিন্তু তুমি আনিতে পারিলে না। তোমার রাজ্য চিরস্থায়ী হইবে না। তুমি আপনার সুখ চাহিলে, সকলের শান্তি চাহিলে না।

"প্রভু, আর পারি না।"

"আচ্ছা, তাহাই হউক। এই অসুরনাশিনী মূর্ত্তিরই প্রতিষ্ঠা কর।

সেইক্ষণে সেই সৈকতভূমে গুরু শিষ্যে মিলিয়া দেশমাতৃকার অসুরনাশিনী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন।

তাহার পরে চন্দ্রশেখর বলিলেন, এখন এই মায়ের রাজ্যে তুমি রাজা হও। এই সাগরবারিতে তোমার অভিষেক করিলাম।

দনুজমাধব চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইলেন। যে পর্য্যন্ত শরীরের বলে রাজ্য শাসন সম্ভব রহিল, দনুজমাধবের বংশ সে পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি রহিলেন। তাহার পরে কি হইল সেকথা না বলিলেও চলে।
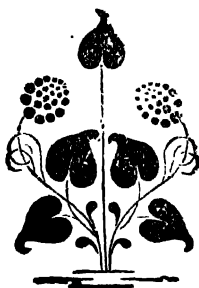
শাহান্ শা

১

কাশ্মীরের নিভৃত উপত্যকায় এক গুহার মধ্যে ভিক্ষু মঞ্জুশ্রী বাস করেন। তাঁহার মস্তক—মুণ্ডিত, পরিধানে—পীতবস্ত্র, সম্বল—ভিক্ষাপাত্র মাত্র। ভিক্ষু, বৃদ্ধ হইয়াছেন, জরায় তাঁহার দেহ শীর্ণ হইয়াছে কিন্তু চক্ষুর্দ্বয় এখনও প্রতিভা-দীপ্ত, মুখমণ্ডল শান্তিতে প্রফুল্ল, চিত্ত নির্ব্বিকার।

নির্ব্বাণ ধ্যান করিয়া তাপস চক্ষু মেলিলেন। দেখিলেন, তাহার সম্মুখে এক গৌরকান্তি যুবক, দণ্ডায়মান। যুবক, ভিক্ষুকে প্রণাম করিল। ভিক্ষু, "মঙ্গল হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস কেন আসিয়াছ?

প্রভু, অদৃষ্টফল জানিতে।

বস।

যুবক উপবেশন করিল। যুবকের নাম কল্যাণসিংহ, কাশ্মীরের রাজপুত্র। ভিক্ষু তাহার দক্ষিণ হস্ততল কিছু কাল দেখিয়া বলিলেন,—"বাছা, রাজপুত্র হইলেই সকলেই রাজা হয় না, কাশ্মীর তোমার হইবেনা। তবে রাজ্যলাভ

অপেক্ষাও এক মহালাভ তোমার ভাগ্যে দেখিতেছি। তুমি সন্ন্যাসী হইবে। তোমার হস্তে 'এক মুদ্রা'।,,

"উহার ফল কি প্রভু ফকীর হওয়া ?

"উহার ফল—সাম্রাজ্য লাভ। তবে তোমার সাম্রাজ্য, ভোগের ভূমিতে নহে, ত্যাগের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভগবান্ তথাগত এইরূপ সাম্রাজ্যেরই চক্রবর্ত্তী হইয়া ছিলেন। তুমি 'শাহান্শা' হইবে।,,

যুবক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

ভিক্ষু বলিলেন—ক্ষুব্ধ হইতেছ কি ? যুবক আবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল, কিছু বলিল না।

ভিক্ষু বলিলেন—বাছা, ক্ষুব্ধ হইওনা। ভোগে মরণ আনে, ত্যাগে অমরত্ব দেয়। আর ভোগই বা কত দিন করিতে পারা যায় ? যৌবন ত চিরদিন থাকে না। এই আমাকেই দেখনা, এ কাশ্মীর আমার হইলে আমি কি উহা ভোগ করিতে পারি ? তোমারও জরা আসিবে। ভোগ কয় দিন করিবে ? ত্যাগ, চিরমধুর ; যৌবনে মধুর, বার্দ্ধক্যে মধুর, মৃত্যুতেও মধুর। তুমি, আপনি ভোক্তা না হইয়া ভোজ্য হও, জগৎ তোমাকে ভোগ করুক। সকলের মঙ্গলের জন্য আপনাকে বিতরণ কর, ভোগ অপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইবে। বাছা,

ত্যাগের আনন্দে গ্লানি নাই, অবসাদ নাই; উহা চিরনূতন।

যুবক আপনি আমাকে ত্যাগের পথে দীক্ষিত করুন। আমি কাশ্মীর চাই না।

ভিক্ষু একবার যুবকের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পরে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এক খানি মণি ও এক খণ্ড মাটী লইয়া আসিয়া বলিলেন—বল দেখি এটা কি ?

"এ যে দুর্লভ মণি।"

"এটা কি ?"

"মাটী।"

"এ দুই-ই কি তোমার নিকট তুল্য বোধ হয় ?'

"কিরূপে হইবে ? মণি আর মাটী—"

"হাঁ এই মণি আর মাটী যখন তুল্য বোধ হইবে, তখন আসিও, ত্যাগের দীক্ষা দিব। এখন তোমার সময় হয় নাই। তুমি এই মণি আর মাটী লইয়া যাও। সপ্তাহ কাল এ দুই, হাতে লইয়া—

মণি—মাটী,

মাটী—মণি

ভাবিতে থাক, বুঝিতে থাক। যখন মণিতে মাটী-

জ্ঞান বা মাটীতে মণি-জ্ঞান হইবে, তখন বুঝিবে দীক্ষার সময় হইয়াছে। এখন নয়।

যুবক, মাটী ও মণি লইয়া চলিয়া গেল।

২

কাশ্মীরের রাজ-প্রাসাদের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া যুবক, এক হাতে মণি, আর এক হাতে মাটী লইয়া ভাবিতে লাগিল—এ মণি, এ মাটী। এটা বহুমূল্য, দুর্লভ, উজ্জ্বল; আর এ মাটীর টুকরা—তুচ্ছ, যেখানে সেখানে মিলে, হাতে লইলে হাত মলিন হয়।

কিন্তু মণি, মানুষের কোন্ কাজে আইসে? মণি খাওয়া যায় না, পান করা যায় না, পরিধান করা যায় না। এ মণির মূল্য কি? মানুষের জীবনে যাহা প্রয়োজনীয়, মণি ত তাহা নয়; সে হিসাবে মণিও যা, মাটীও তা-ই। তবে মণির মূল্য কি? বুঝিলাম, মানুষ, অপ্রয়োজনীয় জিনিষের একটা মূল্য কল্পনা করিয়া লইয়া আপনার মিথ্যা গৌরব ও স্পর্দ্ধার তৃপ্তি সাধন করে। কিন্তু যে এ মিথ্যা গৌরব ও স্পর্দ্ধা চায় না, তাহার নিকট মণির মূল্য কি? তাহার নিকট মণিও যা, মাটীও তা-ই।

মাটী, ধূলির সমষ্টি; মণিও তাহাই। মণিও ধূলা, মাটীও ধূলা। হায়! এ ধূলা লইয়া মানুষ, কতই খেলা

করে! সেও একবারও ভাবেনা—মণি—মাটী ; মাটী—মণি।

মণি ও মাটী হাতে লইয়া যুবক, সপ্তাহকাল এমনই ভাবনায় দিন রাত্রি কাটাইলেন। আর মণি ও মাটীতে তাহার প্রভেদ জ্ঞান রহিলনা।

সাত দিন পরে যুবক, ভিক্ষুর আশ্রমে আগমন করিলেন। ভিক্ষু, জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মণি লইয়া আসিয়াছ?

"না"

"কোথায় রাখিয়াছ?"

"রাখি নাই। ফেলিয়া দিয়াছি।"

"কেন, ফেলিয়াছ?"

"ও পাথরের টুকরা রাখিয়া কি ফল হইবে? ভোজনে বা পানে উহার কোন প্রয়োজন দেখিনা।"

"মাটী?"

"উহাও ফেলিয়া দিয়াছি"

"কেন?"

"উহারও প্রয়োজন দেখিলাম না।"

"দুই-ই কি এক জায়গায় ফেলিয়াছ?"

"হাঁ, প্রভু"

"কেন ? "

"দুই-ই সমান। দুই-ই মাটী।"

উত্তম করিয়াছ। মণি—মাটী, স্বর্ণ—মাটী, টাকা—মাটী, সবই মাটী। এই মাটীর বিকার গুলি লইয়া মানুষ, টানাটানি করিয়া মরে। বুঝিলে ত বাছা, এগুলির কোন প্রয়োজন, মনুষ্যের জীবনে হয় না। এসব বাহিরের জিনিষ। এসবও মাটীই, একবার নিজের দেহের কথা ভাবিয়া দেখ, উহাও মাটী। মেদ, মাংস, অস্থি, মজ্জা—মাটী। এগুলি পৃথক্ পৃথক্ রাখিলে উহা দেখিয়া প্রীতি জন্মেনা, বরং ঘৃণাই হয়। কিন্তু সেই মেদ মাংস রক্ত অস্থিতে গঠিত দেহের উপর মানুষ কতই প্রীতি করে! এই ক্লেদপূর্ণ শরীরটিকে কত সুন্দর বলিয়াই দেখে, ইহাকে ভোগের জিনিষ বা ভোক্তা বলিয়া কতই আয়োজন করে। কিন্তু বাস্তবিক এ দেহ ভোক্তাও নয়, ভোজ্যও নয়। এ একটা মেটে কল মাত্র। 'মৃণালনিন্দিত ভুজলতা' বলিয়া মুগ্ধ মানব যাহার বর্ণনা করে, প্রকৃতপক্ষে সেই বাহু, মাটীর একটা 'দণ্ডযন্ত্র' মাত্র। 'প্রফুল্ল পদ্ম' বলিয়া যে বদনের বর্ণনা করা হয় এবং ভাবের নেশায় মুগ্ধ মানুষ বাস্তবিকই যাহা প্রফুল্ল পদ্ম কি শারদচন্দ্র বলিয়া দেখে, তাহা 'একতাল' মাটী বই

আর কিছুই নহে। চক্ষু বল, কর্ণ বল, শরীরের উচ্চ নিম্ন মাংসপিণ্ড যত বল, সবই মাটীর কল। এক একটা কাজের জন্য এগুলি সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে। কলের আবার সৌন্দর্য্য কি? সুন্দর কুৎসিত তিনি, যিনি এই কলের ভিতরে বাস করেন। প্রেম আর জ্ঞান তাঁহার সৌন্দর্য্য। কিন্তু সেই আসল মানুষটির কথা কেহই মনে করে না। যে কলের মধ্যে তিনি বসিয়া আছেন, সেই কলটিকেই মানুষ ভাবে।

তুমি এই কল আর মানুষটিকে পৃথক করিয়া ভাবিতে ও বুঝিতে থাক।

শ্মশানে যাইও। দেখিতে পাইবে, সেখানে মানুষ চলিয়া গিয়াছে, শুধু কলটি পড়িয়া আছে। সে কল, চলেনা, বলেনা, নড়েনা। সেই মৃণাল বিনিন্দিত ভুজ-বল্লী, পচিয়া মাটী হইতেছে; সেই চটুল নয়ন—স্থির; মাটী হইবার অপেক্ষা করিতেছে। দেখিলে বুঝিবে, যে দেহে এত প্রীতি, যে দেহকে লোকে মানুষ বলিয়া বুঝে, তার এই গতি; সেটা কেবলই মাটী, মানুষ নয়। যখন ইহা বুঝিতে পারিবে, তখন আসিও, দীক্ষা দিব।

যুবক, ভিক্ষুকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

৩

গৃহে ফিরিবার সময় কল্যাণ সিংহ, এক শ্মশানের নিকট দিয়া আসিলেন।

শ্মশানে এক রমণীর শব পড়িয়াছিল, সৎকার হয় নাই। বোধ হয় সৎকার করিতে আসিয়া কোন কারণে জ্ঞাতি বান্ধবেরা শব ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কল্যাণ সিংহ, শবের নিকট যাইয়া বসিলেন। শবের বস্ত্র উন্মোচন করিলেন। রমণী, নবযুবতী, পরম সুন্দরী। তেমন সুন্দরী, কাশ্মীরেও দুর্লভ।

কল্যাণ অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে বর-বপু দেখিলেন। দেখিয়া দেখিয়া শেষে আপনিই বলিতে লাগিলেন— সত্যইত, এ ত দেহ; দেহ ত মানুষ নয়। এ দেহেরত সব আছে, কিন্তু মানুষ কই? কে ইহার মধ্যে ছিল, কেহ দেখে নাই, কোন পথে সে কোথায় গেল, কেহ বলিতে পারে না। যতক্ষণ সে এই দেহে ছিল, ততক্ষণ এই দেহ, চলিত, বলিত, নড়িত, হাঁসিত, কাঁদিত। এখন ইহা দৃষ্টিহীন, বেদনা হীন, শক্তিহীন। এখন ইহা নীরব, নির্জ্জীব। দুদিন পরে মাটীতে মিশিয়া যাইবে।

রূপ,—যে রূপের জন্য জগৎ পাগল; সে রূপের মূল্য কি? রূপও মাটী।

কল্যাণ, ঘরে ফিরিলেন। চিত্ত আজ বড় বিষণ্ণ; কেবলই দেহের কথা মনে হইতেছে। কল্যাণ ভাবিতেছেন, এ মাটীর কল, ইহার উপর আবার প্রীতি কি? রূপ—মিছা কথা; মনের ভ্রম, দৃষ্টির ভ্রম মাত্র। মাটীর কলটিকে মানুষ বলিয়া বুঝি বলিয়াই রূপের একটা ধাঁধা লাগে। এই কলের ভিতরে কে, তাহাকে জানিতে হইবে। সেই ত মানুষ। কিন্তু তাহাকে ত দেখা যায় না।

শব আর সজীব লইয়া সাত দিন কাটিয়া গেল। কল্যাণের আর রূপের মোহ নাই। রূপবতী আর কুরূপা, পুরুষ আর স্ত্রী, সকলের দেহই কল্যাণের নিকট মাটীর কল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এখন, রূপসীর ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষুর যে দৃষ্টিতে জগৎ উল্‌টিয়া যায়, কল্যাণ সে দৃষ্টি দেখিয়া বুঝেন একটা কল নড়িতেছে। বিলাসিনীর মরাল নিন্দিত গতির দিকে চাহিয়া কল্যাণ দেখেন, একটা কল স্থানান্তরিত হইতেছে।

কল্যাণের শব সাধনা হইয়া গেল। সাত দিন পরে আবার ভিক্ষুর নিকটে আসিলেন। স্থবির, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, দেহের কথা কি বুঝিলে?

"প্রভু, দেহ, মাটীর কল; মাটী হইতে হইয়াছে, মাটীতে মিশিবে।"

"রূপ ?"

"উহা মাটীর কলে মনের ভুল।"

"রূপসী ?"

"মৃৎপিণ্ড।"

"চঞ্চল চক্ষু ?"

"মাটী।"

"মৃণাল ভুজ ?"

"সে'ও মাটী।"

কিন্তু বৎস, জগৎ, এই মাটীর মোহে মুগ্ধ, আত্ম-বিস্মৃত। এই মাটীর ঠাট কাটিতে পারা, বড় কঠিন। কামিনী আর কাঞ্চন, রূপ আর রূপা,—মাটীই বটে, কিন্তু মোহের আবরণে ঢাকা। মাটী বলিয়া সহজে মনে আসেনা। একবার আসিলেও বার বার ভুল হয়। সাবধান থাকিও।

৪

কল্যাণ, এইবার তোমার দীক্ষা। কিন্তু এ দীক্ষা, আমি দিব না।

কেন, প্রভু ?

আমাদের কাজ শেষ হইয়াছে। ভগবান্ তথাগত যে করুণা মৈত্রীর বার্ত্তা আনিয়াছিলেন, ভারতে উহার

প্রচার শেষ হইয়াছে। জীবে দয়া, ভারত শিখিয়াছে। এখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম, আর ভারতে থাকিতে পারিতেছেনা।

কেন প্রভু ?

বুদ্ধ যে, করুণা ও মৈত্রীর কথা বলিয়াছিলেন, উহা পণ্ডিত, মূর্খ—সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল, কাজেই সমগ্র ভারত সেই দয়া-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাণের কথা, সকল পণ্ডিতেই বুঝিতে পারে নাই, মূর্খে কি বুঝিবে ? ভিক্ষুসঙ্ঘ নির্ব্বাণ ধ্যান করিতে না পারিয়া নানা দেবদেবীর পূজা পাতিয়াছে। নানা মন্ত্রে ও উপচারে সেই সকল পূজা প্রচার করিয়া তথাগতের নির্ম্মল ধর্ম্ম, মলিন করিয়া ফেলিয়াছে। এখন হিন্দুও তান্ত্রিক, বৌদ্ধও তান্ত্রিক। একদিন জগতের কল্যাণ-মাত্র যাহাদের প্রার্থনীয় ছিল, তাহারা এখন, অণিমা, লঘিমা, মারণ, উচ্চাটন, সিদ্ধি ও ঋদ্ধি চায়। সুতরাং ভিক্ষুগণ এখন তথাগতের পথ হইতে পতিত হইয়াছেন।

আরও কথা, ভগবান বুদ্ধ, জীবের প্রতি করুণা ও মৈত্রীর কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু কেবল নশ্বর জীবের প্রতি প্রীতি করিয়াই, মানুষের তৃপ্তি হয় না, আশা মিটেনা। এ জগৎ যাঁহার অভিব্যক্তি, মানুষের প্রাণ, তাঁহাকে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে চায় কিন্তু বৌদ্ধ

মার্গে তাঁহার কথা নাই। এধর্ম্মে ভক্তি নাই, ধ্যান আছে; প্রার্থনা নাই, চিন্তা আছে। ইহা রসের পথ নহে, শুষ্ক মার্গ। মানুষ, এ শুষ্ক পথে কত দিন থাকিবে? এ পথে মানুষের সকল প্রবৃত্তির তর্পণ হয় না। তাই, বৌদ্ধগণ নানাপথে দেবদেবীর পূজার দিকে ছুটিয়াছে।

তুমি ফতেপুরসিক্রীতে যাও। সেখানে এক ফকীরকে দেখিবে, তিনি আমার বন্ধু, নাম সেলিমশা। তিনি তোমাকে দীক্ষা দিবেন। সে দীক্ষা, বৌদ্ধমার্গে নহে, ইস্‌লামের পথে হইবে। বৌদ্ধ-যানে যে ভক্তি নাই, ইস্‌লামে তাহা আছে। করুণা, মৈত্রী ও সাম্য, ইস্‌লামের দেহ, ভক্তি ও বিশ্বাস উহার প্রাণ। ভক্তি বিনা কেবলই নির্ব্বাণ ধ্যানে তোমার প্রাণের সকল পিপাসা মিটিবেনা; কাহারও মিটেনা।

ফকীরকে বলিও, ভারতে আর বৌদ্ধ-মত প্রচারের প্রয়োজন নাই। আমাদের যাহা শিখাইবার ছিল, শিখাইয়াছি; যাহা বুঝাইবার ছিল, বুঝাইয়াছি। হিন্দুর অপূর্ণ অঙ্গ, বৌদ্ধমতে পূর্ণ হইয়াছে; বুদ্ধ, অবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন।

কিন্তু ভারত এখনও সাম্য শিখে নাই। ভিক্ষুরা

সাম্য শিখাইতে যাইয়া আপনারা পুরোহিত হইয়া বসিয়া-ছিল। ইহা ভারতের জল বায়ুর দোষ।

এখন ভারতে ইসলামের প্রয়োজন হইয়াছে। ইস্‌-লাম, অতর্ক্য বিশ্বাস, ভক্তি ও সাম্য ভারতে শিক্ষা দিবে। যাহারা এখনও পতিত, ইসলাম তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে, তিনি যেন ভারতে ইসলাম প্রচার করেন।

আমি উদীচ্য প্রদেশে চলিলাম। বলিও সময় হইলে মঞ্জুশ্রী, মানস সরোবরের তীরে দেহ রক্ষা করিবে। তাঁহার সহিত এ জন্মে আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই।

৫

ফতেপুরসিক্রীর এক প্রান্তে এক নিজ্জন প্রদেশে সেলিমশার আশ্রম।

কল্যাণ সিংহ, সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বারদেশে শ্বেতশ্মশ্রু, শ্বেতকেশ, এক বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। স্থবির মঞ্জুশ্রীর মতই তিনি দীর্ঘা-কৃতি, তাঁহারই মত প্রফুল্লবদন ও উজ্জল-নেত্র।

যুবক, সেই অশীতিপর বৃদ্ধকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—স্থবির মঞ্জুশ্রী আমাকে তাপস সেলিমশার নিকট পাঠাইয়াছেন।

বৃদ্ধ, যুবকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, মুহূর্ত্তকাল প্রতিভা-দীপ্ত নেত্রে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, আমিই সেলিম ; ঐ আসনে বিশ্রাম কর। স্থবির,কি, বলিয়াছেন ?

যুবক—আমি তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থী হইয়াছিলাম, তিনি বলিলেন—"সেলিমশা তোমাকে দীক্ষিত করিবেন, তাঁহার নিকটে যাও। তাহাকে বলিও, ভারতে বৌদ্ধের কাজ শেষ হইয়াছে। যে করুণা ও মৈত্রী শিখাইবার জন্য ভগবান্ তথাগত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আর বৌদ্ধের প্রয়োজন নাই। এখন বৌদ্ধ যাহা শিখায় নাই, ইস্‌লাম সেই ভক্তি ও ভজন শিখাইবে। আমি উদীচ্য প্রদেশে গমন করিলাম। যথা কালে মানসসরোবরের তীরে দেহ রক্ষা করিব। তাঁহার সহিত আর দেখা হইবেনা।"

সেলিমশা, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আবার যুবকের আপাদ মস্তক ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া বুঝিলেন,দীক্ষার উপযুক্ত পাত্র বটে। যুবককে বলিলেন—বাছা, ভিক্ষু, সত্যই বলিয়াছেন, ভারত করুণা ও মৈত্রী শিখিয়াছে কিন্তু ভজন শিখে নাই, ভক্তির স্বাদ পায় নাই। সাম্য, ভক্তি ও ভজন শিখাইতে ভারতে ইস্‌লামের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু যে, ভক্তির স্বাদ পায়,

সে যে আপনার রসেই ডুবিয়া থাকে, পরকে কিছু বলিবার অবসরই তার ঘটেনা। যদি বা বলে, সে রসের ভাষা, কেউ বুঝে, কেউ বুঝে না।

এই বলিয়া ফকির গাইতে লাগিলেন ঃ—

"তোমার রূপে মজিল আমার আঁখি।
আমি যে দিকে চাই, সেই দিকে,
কেবল তোমায় দেখি।"

তাহার পরে স্বস্থ হইয়া বলিলেন ভগবান্ তথাগত, মানুষকে জগতের সেবক করিয়াছেন, জগদতীতের সেবায় নিযুক্ত করেন নাই। কাজেই বৌদ্ধ মার্গে ভক্তির কথা নাই। সে যুগে করুণা মৈত্রীরই প্রয়োজন ছিল, তাই ভগবান্ বুদ্ধদেব তাহাই মাত্র প্রচার করিয়াছেন। তিনি যুগাবতার। সকল যুগে সকল কথা প্রচারের সময় আসে না। করুণা ও মৈত্রীর কর্ষণে এখন ভক্তির যুগ আসিয়াছে। তোমাদের মত পবিত্র যুবক দিগকে উহা ভারতে প্রচার করিতে হইবে। আজ বিশ্রাম কর।

পরদিন প্রভাতে সেলিম শা,আশ্রমসন্নিহিত এক বট বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, যুবককে আহ্বান করিলেন।

কল্যাণ সিংহ, ফকীরের নিকট যাইয়া সেলাম করিলেন।

ফকীর বলিলেন ঃ—যুবক আমি কে ?

"আপনি সেলিম শা।"

"আমাকে দেখিতে পাইতেছ ?"

"না।"

"কি দেখিতেছ ?"

আপনার দেহ।

"বটে ?"

মনে মনে কহিলেন, মঞ্জুশ্রী, ক্ষেত্রখানি একবারে কর্ষণ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

"কেমন দেখিতেছ ?"

"মাটীর ভাণ্ড। মাটীর একটা কণা।"

এই ভাণ্ডেই রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ আছে। এ রূপ রসের আকর্ষণ বড় শক্ত। সেই আকর্ষণে এ মাটীকে আর মাটী বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় ইহাই বুঝি খাঁটি ; ইহাই মানুষ। স্থবিরের কৃপায় তুমি মাটী ও খাঁটি পৃথক্ বুঝিয়াছ, বড়ই প্রীত হইলাম।

এই মাটীকে যিনি এমন করিয়া গড়িয়াছেন, এতরূপ, এতরস, এতগন্ধ, ও এত আকর্ষণ দিয়াছেন, এমন রসের ধারায় ডুবাইয়া রাখিয়াছেন এবং যাহার হুকুমে এই রূপ রস আবার মাটী হইবে, তাঁহাকে জান ?

না প্রভু, জানি না।

তাঁহাকে জানাই জীবের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। তুমি তাঁহাকে জানিতে চাহিও।

জ্ঞানে ও বিচারে তাঁহার কথা গোলমাল করিয়া ফেলে, ভক্তি ও বিশ্বাসই সহজে তাঁহার পথে লইয়া যায়।

শোন যুবক, এক দিন এ জগৎ ছিলনা, কিছুই ছিলনা, ছিলেন কেবল তিনি, যিনি এ বিশ্বের কারণ। তাঁহার ইচ্ছায় জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। আবার এ বিশ্ব যখন বিলুপ্ত হইবে, তখন থাকিবেন কেবল তিনি। তিনি অবিনাশী, সচ্চিদানন্দ, বাক্য ও মনের অগোচর।

কল্যাণ, ভালবাসা, মানুষের সকল বৃত্তির প্রধান বৃত্তি। কিন্তু ভালবাসে বলিয়াই মানুষের যত দুঃখ। যে কাহাকেও ভালবাসেনা, কাহাকেও আমার বলিয়া মনে করেনা, তাহার দুঃখ নাই। তবে তাহার সুখও নাই। ভালবাসাতেই আবার মানুষের যত সুখ। এই সুখ চাহে বলিয়াই মানুষ বাপ মাকে ভালবাসে, পত্নীকে প্রেম করে, সন্তানকে স্নেহ করে। যাহার ভালবাসার পাত্র নাই, সে অগত্যা একটা পশু পাখী পুষিয়া তাহারই উপর প্রাণের ভালবাসা ঢালিয়া দেয়।

কিন্তু আমাদের এই ভালবাসার পাত্রগুলি—সকলেই

নশ্বর ; চিরদিন ইহাদিগকে ভালবাসিতে পারা যায় না। ইহারা চিরদিন একরূপ থাকে না। কাজেই ইহাদিগকে ভালবাসিয়া হৃদয়ের সম্যক্ তৃপ্তি হয় না, সকল আকাঙ্ক্ষা মিটেনা। এই জন্য মানুষ জগতের কারণ, জগদতীত সেই অবিনাশীকে ভালবাসিতে চায়। এ ভালবাসার নাম ভক্তি। একবার এ অবিনাশীর সন্ধান পাইলে মানুষ আর সংসারের কোন একটি নশ্বর পদার্থের প্রীতিতে আবদ্ধ হয় না। তখন সকল জগৎ তাহার 'আমার' হয় ; চেতন অচেতন, জীব, উদ্ভিদ—সকলই তাহার প্রেমের পাত্র হয়। সেই জগৎ কারণ, নিত্য, তিনি এক, অদ্বিতীয়। তুমি তাঁহাকে প্রণাম কর।

যুবক, প্রণাম করিল।

বল, 'লা এলাহা ইল্লেল্লা।' ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়।

যুবক বলিল,—লা এলাহা ইল্লেল্লা।

শোন বাবা, হজরত মহম্মদ, এই তত্ত্ব আরব দেশে শিখাইয়াছেন। সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে প্রণাম কর। যুবক, প্রণাম করিল।

তুমি আদমের ন্যায় পবিত্র ও সরল, আজি হইতে তোমার নাম আদম হইল। আমি তোমাকে 'বাবা' বলিয়াছি, লোকেও তোমাকে 'বাবা আদম' বলিবে।

আদম, একের তত্ত্ব আপনি অবগত হইয়া ভারতে প্রচার কর। হিন্দু ঋষিরা এই তত্ত্ব ধ্যানে অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু সকলকে বলেন নাই। তখন বলিবার সময় হয় নাই। এখন সে সময় আসিয়াছে।

এখন পূর্ব্বদেশে গমন কর। সেখানে দেখিবে, বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধ রাজগণের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত এক রক্তমৃত্তিক প্রদেশ অরণ্যে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই দেশে অবস্থান করিয়া সকলকে ভক্তি-মার্গ ও ভজনের পন্থা প্রদর্শন কর। উহাই তোমার সাধন ভূমি ও প্রচার ক্ষেত্র।

বাছা, আপনাকে তৃণ হইতে ছোট বলিয়া জানিও এবং গাছের অপেক্ষা সহিষ্ণু হইও। তবেই ভগবানের নাম লইবার শক্তি হইবে।

৭

গুরুকে প্রণাম করিয়া বাবা আদম পূর্ব্বদেশ অভিমুখে গমন করিলেন। পথে বৎসরাধিক কাল গেল। এই বৎসরাধিক কাল, যথালব্ধ আহার্য্যে শরীর ধারণ করিয়া বাবা আদম কাশ্মীরের রাজভোগ বিস্মৃত হইলেন।

পথ যে দিকে গিয়াছে, বাবা আদম সেই দিকে যাইতেন, কোথায় যাইবেন লক্ষ্য থাকিত না। তখন

তাঁহার মন, ধ্যানস্থ ; সম্মুখের পদার্থ দেখিয়াও দেখিতেন না। সুতরাং যে দেখিত, সে-ই তাহাকে পাগল মনে করিত, কিন্তু পাগলের সেই সুন্দর কান্তি ও প্রফুল্ল মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিত না।

পূর্ব্বদিকে আসিতে আসিতে বাবা আদম কোহ্‌স্থানে ঢাকার (১) অরণ্যময় প্রদেশে আসিয়া রক্তমৃত্তিক ভূমি পাইলেন। কত রাজধানী ও কত নগরের ভগ্নাবশেষ, কত স্তূপ ও চৈত্যের ইষ্টক প্রস্তর, সেই অরণ্যের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু জনপ্রাণী নাই। আদম বুঝিলেন, ইহাই তাঁহার গুরুর বর্ণিত ভূমি।

সেই নির্জ্জন প্রদেশে শাল বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া আদম ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার অন্তরে ব্রহ্ম-জ্ঞান ফুটিয়া উঠিল। আদম, এ জগৎ তন্ময় দেখিতে লাগিলেন। জড় ও জীব সকলকে আপ-

---

(১) ঢাকা হইতে মধুপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত অরণ্য ভূমির নাম 'কোহ্‌স্থান ঢাকা'। ইহার মৃত্তিকা রক্তবর্ণ এবং উচ্চ। এই অরণ্য প্রদেশে বহু রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। বাবা আদম এই অরণ্য প্রদেশে যে স্থানে সাধন করিতেন তাহার নাম—শাহান শার চালা।

নার বলিয়া মনে হইল, করুণা ও মৈত্রীতে প্রাণ ভরিয়া গেল, হৃদয়ে শান্তির ধারা প্রবাহিত হইল। বাবা আদম, সিদ্ধি লাভ করিলেন।

সেই অরণ্য প্রদেশের পশ্চিম দিকে বহুদূর বিস্তৃত নিম্নভূমি, নল, খাগড় ও হিজলে পরিপূর্ণ। তাহার পরে রাজা কংসের রাজধানী—হিঙ্গানগর। কংস, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম তখন কেবলই করুণার ধর্ম্ম ছিলনা, উহা নানা মতবাদে দূষিত হইয়াছিল।

সিদ্ধতাপস বাবা আদম, নির্জ্জন অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া নিম্নভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার পুণ্য-প্রভাব দর্শনে দলে দলে লোক তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল।

চল্লিশ জন ত্যাগী শিষ্য সঙ্গে লইয়া বাবা আদম পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে হিঙ্গা-নগরের উপকণ্ঠে এক আকন্দ বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করি-লেন। শিষ্যদিগকে বলিলেন, ইহাই আমার প্রচার ভূমি ; আর কোথায়ও যাইব না।

আকন্দবৃক্ষ তলে বসিয়া বাবা আদম ঈশ্বরের নাম প্রচার করিতে লাগিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া ভক্তির পথে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

কংস, সংবাদ পাইলেন, এক দরবেশ চল্লিশ জন শিষ্য লইয়া রাজধানীর প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে। দরবেশ, দেবদেবী মানেনা, তথাগতের কথা বলেনা, নির্ব্বাণ ধ্যান করে না। বলে ঈশ্বর এক, মানুষ সকলে সমান। সে সকলকে ভক্তি করিয়া ঈশ্বরের নাম লইতে উপদেশ দিতেছে। তাহার মস্তকে দীর্ঘকেশ, মুখে দীর্ঘশ্মশ্রু।

কংস, আদেশ করিলেন যে নির্ব্বাণ ধ্যান করে না, আমার রাজ্যে তাহার ঠাই নাই, সে সন্ন্যাসীই হউক, কি গৃহীই হউক, তাহাকে তাড়াইয়া দাও।

কিন্তু সন্ন্যাসীকে তাড়াইয়া দেওয়া সহজ হইল না। গৌড়ের রাজ-সৈন্য নিকটে ছিল। উহার সেনাপতি রোস্তম খাঁ বাবা আদমের শিষ্য হইয়াছিলেন। দরবেশের উপর অত্যাচার হইবে শুনিয়া রোস্তম খাঁ, কংসের রাজধানী আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণে হিঙ্গানগর বিধ্বস্ত হইল, কংস পুড়িয়া মরিলেন।

রোস্তম, রাজধানী ধ্বংস করিয়া আসিয়া দরবেশকে সেলাম করিল। বাবা আদম, জিজ্ঞাসা করিলেন—রোস্তম, কোথায় গিয়াছিলে?

বাবা, রাজা কংস আপনাকে এই স্থান হইতে তাড়াইয়া দিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। আপনি স্ব-ইচ্ছায় স্থান

ত্যাগ না করিলে অপমান করিবে, এমনও শুনিয়াছিলাম, তাই তাহার রাজধানী আক্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। রাজধানী বিজিত হইয়াছে, কংস পুড়িয়া মরিয়াছে।

ফকীর, শিহরিয়া উঠিলেন। করিয়াছ কি ?

প্রভু, সে বিধর্ম্মী।

ধর্ম্মের আবার 'স্ব' আর 'বি' কি রোস্তম ? সকল ধর্ম্মই মানুষের ধর্ম্ম।

প্রভু, সে 'আল্লা' মানিত না।

তাহাতে আল্লার কি ক্ষতি ? সে আল্লা মানিত না, কিন্তু আল্লা তাহাকে মেহের করিয়া এই দুনিয়ার রাজগিরি দিয়াছিলেন, তুমি তাহার দুষমন্ হইলে কেন ? আল্লা যাহা সহিয়াছিলেন, তোমার তাহা অসহ্য হইল কেন, রোস্তম ?

প্রভু, সে প্রতিমা পূজা করিত।

হইতে পারে, খোদা, তাহার সেই পূজাই কবুল করিতেছিলেন। তুমি সেই জগৎপতির মর্জ্জি কি বুঝিবে ? যখন সময় আসিত, খোদার মেহের হইত, সে আপনি পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিত। পুতুলের মধ্যে যাহাকে ভাবিতেছিল, এ দুনিয়ার জলে স্থলে তাহাকে দেখিত।

রোস্তম, তুমি যাহা করিয়াছ, উহা ইস্‌লামের নীতি নহে। ইস্‌লাম, মানুষকে ভালবাসিতে শিখায়, দ্বেষ করিতে শিখায় না; সাম্য শিখায়, ভেদ শিখায় না। তরবারী চালনায় রাজ্য বিস্তার হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার হয় না। তুমি ঘোরতর অন্যায় করিয়াছ। জীব, ভগবানের পরম সৃষ্টি, এ জীবের রক্তপাত যে করে খোদা, তাহাকে মাপ করেন না।

রোস্তম, অধোমুখ হইল।

৮

আকন্দ বৃক্ষের অদূরে বাবা আদমের কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি সেই কুটীরে বসিয়া সাধন করেন।

ভূমিতল তাঁহার শয্যা, ছিন্নবসন তাঁহার পরিধেয়, কিন্তু সেই নিঃসম্বল তাপসের মুখে স্বর্গের মহিমা দেখিয়া সকলে তাহাকে 'শাহান শা' বলিতে লাগিল। শাহান্ শার নেত্রে, জীবের জন্য করুণাধারা ক্ষরিত হইত। তাহার মুখের দিকে যে চাহিত, সেই বিগলিত হইত।

প্রতিদিন অপরাহ্ণে শাহান শা, শিষ্যদিগকে ভক্তি তত্ত্বের উপদেশ দিতেন, ভজনের কথা বলিতেন। সে মধুর কথা শুনিবার জন্য বহুদূর হইতে দলে দলে লোক

আসিত, সহস্র সহস্র লোক প্রতিদিন যোড়হাতে তাঁহার চারিদিকে বসিয়া থাকিত।

দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে বাবা আদমের ভক্তির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। বাবা আদম সেই সিংহাসনের 'শাহান শা' হইলেন। সে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কথা।

এখনও আটীয়ায় (১) শাহান শার সমাধি ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোক মস্তক অবনত করিয়া সেই মহাপুরুষের পুণ্য-স্মৃতির সম্মান করে।

(১) আটীয়া—ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত। এই স্থানে শাহান্ শার সমাধি আছে।

মীরাবাই।

(১)

রাজপুতনায় সেরতা গ্রাম। সেরতার রাঠোর সর্দ্দারের গৃহে গোবিন্দজী প্রতিষ্ঠিত। সর্দ্দার বৈষ্ণব।

এক দিন বসন্তকালের প্রভাতে গোবিন্দজীর প্রাঙ্গণে লোকারণ্য। এক কিশোরী সঙ্গিনীদিগকে লইয়া গাইতে ছিলেন :—

"ভজহুঁরে মন, নন্দ নন্দন, অভয় পদারবিন্দ রে
মানুষ দুর্লভ জনম সত-সঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধু রে।
শীত আতপ বাতবরিষণ এ দিন যামিনী জাগি রে,
বৃথাএ সেবনু কৃপণ দুরজন চপল সুখলব লাগি রে।
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতীত রে,
কমল দলজল জীবন টলমল ভজহুঁ হরিপদ নিত রে।,,

যে, এ সঙ্গীতে শুনিল, সে-ই মুগ্ধ হইল ; ভাবাবেশে তাহারই নয়নে অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

কিশোরী, নিরুপম সুন্দরী ; তেমন সুন্দরী রাজস্থানে কেহ কখন দেখে নাই। তাহার সেই সুন্দর মুখে ভক্তির যে জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত্রিভুবনেও

দুর্লভ। সুন্দরীর স্বর ঝঙ্কার নিরুপম ; সে স্বরে প্রাণের আর্ত্তি ও আকুলতা যেন মূর্ত্তিমতী হইতেছিল।

সেই স্থান, সেই কাল, সেই রূপ, সেই বেদনাময় স্বর-লহরী আর সেই নির্বেদ বৈরাগ্যের কথা—সকলে মিলিয়া এক অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। বিপুল জন সঙ্ঘ, সেই ভাবের আবেশে স্তব্ধ ও তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল।

কিশোরী, সেরতার রাঠোর সর্দ্দারের কন্যা, নাম মীরা। মীরা, প্রত্যহ গোবিন্দজীকে সঙ্গীত শুনাইয়া থাকেন। আজিও শুনাইতেছিলেন।

বার বার "ভজহুঁ হরিপদ নিতরে" গাইতে গাইতে মীরার বদন, অশ্রুজলে সিক্ত হইল ; প্রফুল্ল কমল দলে শিশির বিন্দু পড়িলে যেমন শোভা হয়, সে মুখের তেমন শোভা হইল। মীরার রোমাঞ্চ হইল, কণ্ঠ গদ্‌গদ হইয়া আসিল।

নিয়ম কাল অতীত হইলে সঙ্গীত থামিল। জনমণ্ডলী, চৈতন্য পাইয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। কিন্তু একটি যুবক, গেল না। সে যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া অতৃপ্তনয়নে সঙ্গীতকারিণীকে দেখিতে লাগিল।

মীরা, এতক্ষণ গোবিন্দজীর মুখের দিকে চাহিয়া গাইতে ছিলেন, গোবিন্দজীকে মনের কথা শুনাইতেছিলেন। কে তাঁহার গান শুনিতেছে, কে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, কে কোথায় রহিয়াছে, সে ভাবনা তাঁহার ছিল না। এতক্ষণ মীরা পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীতে ছিলেন না; গোবিন্দজীকে লইয়া ভাবের এক স্বর্গ-রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। সেখানে কেবল গোবিন্দজী আর মীরা, মীরা আর গোবিন্দজী; আর কেহই ছিল না।

সঙ্গীত থামিল, ভাবের রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। মীরা এখন মর্ত্ত্যে। এখন, লজ্জা, ভয়, রাগ, বিরাগ দেহের সকল ধর্ম্মই তাহার ফিরিয়া আসিল। মীরা এতক্ষণ দেবী ছিলেন, এখন মানবী হইলেন, মেরতার রাজ-নন্দিনী হইলেন।

মীরা, দক্ষিণে চাহিয়া দেখিলেন, এক রাজপুত-যুবক তাঁহার দিকে অনিমিষনেত্রে চাহিয়া আছে। মন্মথের মত তাহার গৌরকান্তরূপ, প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু। মীরা মনে মনে বিধাতার সৃষ্টির প্রশংসা করিলেন। কিন্তু লজ্জায় তাঁহার চক্ষু আনত হইয়া আসিল, একবার বই দেখিতে পারিলেন না।

গোবিন্দজীর দুয়ারের অতিথি সৎকারের ভার রাজকন্যার উপর ছিল। সাধু মহান্ত যে আসিত, রাজনন্দিনী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের সেবাপরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিতেন, স্বয়ং তাহাদিগকে আদর ও আপ্যায়ন করিতেন। এ যুবক অতিথিকে কিন্তু রাজনন্দিনী কিছু বলিতে পারিলেন না। যুবকের দিকে চাহিতেই তাহার যেন কেমন লজ্জা করিতে লাগিল।

মীরা, এক সঙ্গিনীকে বলিলেন, যা ঐ রাজপুত যুবককে বল্, অনুগ্রহ করিয়া এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। রাজপুত, সামান্য নহেন, হয় কোন রাজা, নয় রাজপুত্র; ছদ্মবেশে আসিয়াছেন। অনুরোধ না করিলে থাকিবেন কেন? আর, অতিথির আপ্যায়নই ত আমাদের কাজ।

সঙ্গিনী বলিল, তা ঠিক। তবে রাজাই হউন, আর রাখালই হউন, আমাদের সবই সমান, সবই নর-নারায়ণ। তোমার কিন্তু রাজনন্দিনী, আজ ভেদবুদ্ধি দেখিতেছি।

"যুবক কে?"

"জানি না।"

"জানিনা, তবে সরম কেন?"

"কি জানি, সরম আপনি হইতেছে, উহাঁর দিকে চাহিতে পারিনা। তুই যা।"

সখী, উঠিয়া গেল। যুবকের নিকটে যাইয়া বলিল, মহাশয়, আমাদের রাজনন্দিনী, আপনাকে এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করিলে, তিনি কৃতার্থ হইবেন।

যুবক কহিলেন, ভদ্রে, রাজনন্দিনীর অনুরোধ তাঁহার আপন মুখে শুনিতেই আশা করি।

তখন আর উপায় নাই। লজ্জারক্তমুখে মীরা আসিয়া আতিথ্যের অনুরোধ জানাইলেন। রাজপুত যুবকও তাহাই চাহেন, বহু দূর হইতে তিনি মীরার গান শুনিবার জন্য ছদ্ম বেশে আসিয়াছেন। একবার মাত্র সে গান শুনিয়া তৃপ্তি হয় নাই বরং আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়াছে। গান শুনিতে শুনিতে মীরার রূপেও তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

যুবক অতিথি হইলেন।

২

সন্ধ্যায় গোবিন্দজীর আরতি হইল। আরতির পরে মীরা, গোবিন্দজীর সম্মুখে বসিয়া গাইতে লাগিলেন :—

"তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম
সুত সিত রমণী সমাজে,
তোহে বিসরি মন তাহে সমপলু
অব মঝু হব কোন কাজে ?
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লু
শিশু জরা কতদিন গেলা,
যৌবনে মোহে ভুলি রসরঙ্গে মাতলু
তোহে ভজব কোন বেলা ?"

বৃদ্ধেরা এ গান শুনিয়া ফুকরিয়া কান্দিতে লাগিল, যুবকেরা স্তব্ধ হইল।

মুগ্ধ মানবের, দুর্লভ জন্মের অর্দ্ধেক নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়। বাকী যাহা থাকে তাহার বেশির ভাগই শৈশব ও জরা। তাহার পরে যাহা থাকে,—যে টুকুতে ভগবানের ভজন করা যাইতে পারে, সেই যৌবন টুকুও মানুষ, ক্ষুদ্র আনন্দে—তুচ্ছ বিষয়-রসে ডুবাইয়া রাখে, ভগবানকে নিবেদন করিয়া দেয় না। হায়, মানুষের কি দুর্ভাগ্য! —ভাবিতে ভাবিতে শ্রোতারা কান্দিতে লাগিল। যে গাইতেছিল, তাহারও অশ্রুপাত হইল।

রাজপুত যুবকও এগান শুনিলেন, মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মনে হইল, এমন কথা নিত্য শুনিতে পারিনা, কি

দুর্ভাগ্য! ইহা একদিন শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারিনা। মীরা মানবী নহে,—দেবী। এদেবীকে না পাইলে এজীবন নিষ্ফল।

সঙ্গীত সমাপ্ত হইল। শ্রোতারা চলিয়া গেল। অতিথি অভ্যাগতের আহার হইল। রাজনন্দিনী, ঘরে ফিরিবেন, এমন সময়ে রাজপুত যুবক, তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, রাজকুমারী, আমি আপনার অনুরোধ রাখিয়াছি, আমার একটি অনুরোধও আপনাকে রাখিতে হইবে। এই বলিয়া যুবক, একটী অঙ্গুরীয়ক, রাজকন্যার হাতে দিয়া বলিলেন, গ্রহণ করুন ; এই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞান, একদিনের এই অতিথির কথা কখন কখন আপনার স্মৃতিপথে আনিতে পারিবে বলিয়া দিতেছি। গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই আমাকে যাইতে হইবে, আপনার সহিত আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই, তাই, অসময়ে এই ধৃষ্টতা করিলাম, ক্ষমা করিবেন।

মীরা, একবার রাজপুত যুবকের দিকে চকিতের মত চাহিলেন, কিছু বলিতে যেন ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

যুবক চলিয়া গেল।

৩

মেরতার রাঠোর সর্দ্দারের কন্যা মীরার নাম, রাজস্থানের গ্রামে ও নগরে সকলেই জানিত। মীরার রূপের কথায় রাজপুতনা ভরিয়া গিয়াছিল।

মিবারের রাজধানী চিতোরের গৃহে গৃহেও মীরার রূপের কথা হইত। প্রদোষে ও উষায়, দিনে ও রাত্রিতে চিতোরের পথে পথে লোকে গাইত ঃ—

"মীরা কহে বিনা প্রেম সে নেহি মিলে নন্দ লালা।"

তখন মহারাণা কুম্ভ, চিতোরের অধিপতি। কুম্ভ,—কুমার; বীরত্ব আর কবিত্ব লইয়া তাঁহার দিন কাটিতেছিল। কুম্ভ, ভাবিতেছিলেন, তাহাকেই মহিষী করিব, যাহার প্রাণে প্রীতির নির্ঝর আছে; যে ফুলের মত পবিত্র, স্ফটিকের মত নির্ম্মল।

এমনই সময়ে শুনিলেন ঃ—

"মীরা কহে বিনা প্রেম সে নেহি মিলে নন্দ লালা।"

আরও শুনিলেন, যে এ প্রেমের কথা বলে, সে অনিন্দ্যসুন্দরী, রাজপুতনায় তেমন রূপ কাহারও নাই। কুম্ভ, মীরাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

কিন্তু মেরতার রাঠোর সর্দ্দার, মারওয়ারের এক ক্ষুদ্র সামন্ত। তাহার গৃহে চিতোরের মহারাণার গমন—তাহাও

আবার একটি কিশোরীকে দেখিবার জন্য, একটা গান শুনিবার জন্য—কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। লোকে কি বলিবে, বলিয়া, কুম্ভ, যাই যাই করিয়াও যাইতে পারিলেন না।

কিন্তু আর থাকাও যায় না। চারিদিকেই কেবল —"মীরা কহে" "মীরা কহে" ধ্বনি। সে মীরার কথা আবার একবারে প্রাণের ভিতর আসিয়া পৌঁছে, একবারে মর্ম্ম স্থানে আঘাত করে। মীরা যাহা কহে, তাহা একবারে প্রাণের কথা। এমন প্রাণের কথা, যে বলিতে জানে, তাহাকে কি না দেখিয়া থাকিতে পারা যায়? কুম্ভের সকল বন্ধন টুটিয়া গেল। ছদ্মবেশে কুম্ভ, মেরতা গেলেন, মীরাকে দেখিলেন, গান শুনিলেন, অঙ্গুরী দিলেন; আর সেই সঙ্গে আপনার প্রাণটিকেও দিয়া আসিলেন। চিতোরে আসিলেন, কেবল দেহ লইয়া।

না দেখিয়া ছিল ভাল। দেখিয়া প্রমাদ হইল। মীরার সেই স্বর, কুম্ভের হৃদয়ে নিয়ত বাজিতে লাগিল। মীরার রূপে চিতোর ভরিয়া গেল, কুম্ভ যে দিকে চাহেন দেখেন কেবলই মীরা।

প্রভাতে পাখীরা কলধ্বনি করে, কুম্ভ শুনেন মীরা গাইতেছে। সরোবরে পদ্ম ফুটে, কুম্ভ দেখেন মীরা

হাসিতেছে। বাতাসে লতা দোলে, কুম্ভ দেখেন যেন মীরা বাহু তুলিয়া তাহাকেই ডাকিতেছে।

রাণা আর সিংহাসনে বসেন না, দরবার করেন না। যে দিকে শুনেন কেহ গাইতেছে—"মীরা কহে", সেই দিকে কাণ পাতিয়া থাকেন।

কথা গুপ্ত রহিলনা। মন্ত্রীরা শুনিল, রাজমাতা শুনিলেন। অগত্যা রাজমাতা মীরাকে চিতোরের মহিষী করিবার জন্য মেরতায় দূত পাঠাইলেন।

মেরতার রাঠোর সর্দ্দার, দূতের মুখে এ সংবাদ শুনিয়া আপনার সৌভাগ্য মনে করিলেন। গোবিন্দজীর মন্দিরে সে দিন মহোৎসব হইল।

দূত, বিবাহের দিন স্থির করিয়া চিতোরে আসিল।

৩

কিন্তু যাহার বিবাহ তাহার আনন্দ নাই। এ সংবাদে মীরা, প্রফুল্ল হইল না।

সেই অঙ্গুরী পরদিন প্রাতে দেখিয়াই মীরা চিনিয়াছিলেন রাজপুত যুবক কে? সখীরাও জানিয়াছিল। অঙ্গুরী ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া মীরা যত্ন করিয়া উহা রাখিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকালে মীরা, গোবিন্দজীর মন্দিরে আসিয়া

বসিয়াছেন। সঙ্গিনীরা, রাজনন্দিনীর সৌভাগ্যে আনন্দিতা হইয়া হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। একজন বলিল, এমন যে হইবে, তাহা তখনই জানি।

মীরা—"কখন?"

সখী—"যখন তোমার মুখ, সেই রাজপুতকে দেখিয়া লাল হইয়া গেল।"

মীরা—কি জানি, তাহাকে দেখিয়া কেন সরম হইল। কিন্তু সত্য বলি সখী, চিতোরের মহিষী হইতে আমার আগ্রহও নাই, আনন্দও নাই। গৃহকর্ম্ম আমার সাজিবে না। রাণীগিরিত দূরের কথা।

সখী—কেন? রাজপুতনী ইহা অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য কামনা করিতে পারে?

মীরা—আমি এ সৌভাগ্য চাই না।

সখী—কেন?

মীরা—মহারাণা, আমাকে লইয়া সুখী হইতে পারিবেন না। আমার মন, গোবিন্দজীউকে দিয়াছি, আর উহা ফিরাইয়া আনিতে পারিব না। শুধু দেহ লইয়া মহারাণা কি করিবেন?

সখী—মহারাণা যে তোমার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন। দিন রাত্রি মুখে কেবলই "মীরা কহে"—

মীরা—অনুরাগী কিনা জানি না। তবে তাঁহার মোহ ঘটিতে পারে বা ঘটিয়াছে। রূপের মোহ, স্বরের মোহ, এ সকল মোহ হইতেও শেষে অনুরাগ আসে কিন্তু ;—

সখী—কিন্তু কি ?

মীরা—মোহই হউক কি অনুরাগই হউক, মহারাণা সুখী হইবেন না, একথা তাঁহাকে আগেই বলা ভাল। আমার মন, আমার নাই ; উহা গোবিন্দজীকে দিয়াছি। আর একবার তাঁহার সহিত দেখা হইলে ভাল হইত, আমি নিজেই তাঁহাকে একথা বলিতাম।

৪

সে সুযোগ ঘটিল। বিবাহের দিন দূরবর্ত্তী ছিল, কুম্ভ, ততদিন মীরাকে একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। গোপনে মেরতা আসিলেন। কেহ তাহা জানিল না।

কিন্তু যাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, সে কিরূপে উহা জানিল। মীরা, এক সঙ্গিনীকে বলিলেন, সকল লোকের পাছে মহারাণা ছদ্মবেশে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে বল, আমি তাঁহার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিব।

আবার চোরের মত আসিয়া মীরার কাছে ধরা

পড়েন, কুম্ভের ইচ্ছা ছিল না। ভাবিয়াছিলেন, গোপনে আসিয়াছেন, একবার মীরাকে দেখিয়া গোপনেই চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহা হইল না। কুম্ভ লজ্জিত হইলেন।

আরতির পরে সঙ্গীত হইল, সকলে চলিয়া গেল। এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে মীরা, রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সঙ্গে বিশ্বস্তা সখী।

প্রথমে মীরাই কথা বলিলেন। সে দিন লজ্জা নাই, প্রাণের তন্ত্রী, একটু উচ্চ গ্রামে বাঁধা।

মীরা কহিলেন, মহারাণা, দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিবেন। চিতোরের মহিষী হইতে পারিলে রাজপুতনী, ইন্দ্রাণী হইতেও চায় না। কিন্তু মহারাণা, এ দীনাকে লইয়া আপনি সুখী হইবেন না।

রাণা—কেন মীরা এমন নিষ্ঠুর কথা বলিলে? তোমাকে লইয়া আমি চিতোরের মাটীতে স্বর্গ গড়িব কল্পনা করিয়াছি।

মীরা—মহারাণা, আমার মন, আমার নাই, উহা গোবিন্দজীকে দিয়াছি। আর ফিরাইয়া আনিবার উপায় নাই। মন বিনা, কেবল দেহ দিয়া স্বামি-সেবা হয় না। আমি অপরাধিনী হইব।

রাণা—তোমার অপরাধ অসম্ভব, মীরা। তুমি যে

দিন চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবে, সে কি সুখের দিন! এত রূপ রাজপুতনায় নাই, এত গুণ, ভারতে নাই; মীরা, বিধাতাই তোমাকে রূপগুণের রাণী করিয়া পাঠাইয়াছেন।

মীরা—মহারাণা, এ তুচ্ছ দেহটার কথা বলিয়া দাসীকে অপরাধিনী করিতেছেন। রাণীগিরি এ হতভাগিনীর কর্ম্ম নয়। গোবিন্দজীর সেবা ছাড়া, মীরার প্রাণ আর কিছুই চায় না। মেবারপতি, এ হতভাগিনীকে লইয়া সুখী হইবেন না।

রাণা—না, না. মীরা ওকথা বলিও না। তোমার দর্শনে সুখ, তোমার সঙ্গীতে সুখ, তাহার অধিক আমি কিছু চাই না।

কুম্ভ বিদায় হইলেন, মীরা ফিরিলেন। বিষণ্ণমুখে মীরা সখীকে বলিলেন, সখী, মহারাণা ভুল করিলেন।

মীরার অদৃষ্টলিপি ফলিতে চলিল।

৫

মীরা, চিতোরে আসিলেন, মহিষী হইলেন। কিন্তু প্রথমেই একটা গোল হইল,—রাজ পরিবার একলিঙ্গ ও ভবানীর সেবক, মীরা বৈষ্ণবী; মীরার ভজন পদ্ধতি ও

নামগান চিতোর রাজ-পরিবারের কাহারও ভাল লাগিলনা।

দুই চারি দিন গেল। মীরার মুখ ক্রমেই মলিন হইতে লাগিল, আর সে প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় শোভা রহিলনা।

এত সাধ করিয়া এত সুখের আশায় কুম্ভ যাহাকে আনিয়াছেন, সে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। রাণার আদর যত্ন, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ও ভোগবিলাস কিছুতেই মীরা আনন্দিত হয় না। রাণা, ক্ষুব্ধ হইলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল, এ বনবিহঙ্গীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া ভাল করি নাই।

মীরা, স্ত্রীর কর্ত্তব্য বলিয়া স্বামী সেবা করে, কিন্তু উহা কেবলই দেহ দিয়া, প্রাণ দিয়া নহে। তাহার পরিচর্য্যা, আকাঙ্ক্ষা হীন, মধুরবাক্য রসহীন, হাস্য উল্লাসহীন। মীরা এখনও সঙ্গীত করে, রাণা গাইতে বলিলেই গায় কিন্তু সে সঙ্গীতে আর সে রস নাই, সে আনন্দ নাই। হায় হায়, যে সুখের জন্য কুম্ভ, মীরাকে আনিলেন, সে সুখ কোথায়? রাণা, ব্যথিত হইতে লাগিলেন।

আরও কতক দিন গেল। রাণা, আর থাকিতে না

পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মীরা, এই রাজ্য, এই ঐশ্বর্য্য, কিছুই তোমাকে সুখী করিতে পারিতেছে না। বল তোমার কিসের দুঃখ। যাহা পাইলে তোমার চিত্ত প্রফুল্ল হইবে, বল আমি তাহাই দিব।

মীরা কহিল—স্বামিন্, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য এসব ত কখনও চাই নাই, কাজেই ইহা পাইয়াও আনন্দ হয় নাই, না পাইলেও দুঃখ হইত না। পিতৃগৃহে গোবিন্দজীর সম্মুখে কীর্ত্তনই ছিল মীরার আনন্দ; আজও প্রাণটা তাহাই চায়। আজও মনে হয় তেমনই কীর্ত্তন করিয়া জনম কাটি।

রাণা—কেন মীরা,আমি ত প্রতিদিনই তোমাকে গাইতে বলি, তুমিও ত গানকর। ইহাতে কি আনন্দ হয় না?

মীরা—না মহারাজ, এ কীর্ত্তন, স্বামীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত; ইহা রাজার আদেশ পালন। ইহাতে প্রাণ কই স্বামিন!

রাণার মুখ গম্ভীর হইল। কিছুকাল কি ভাবিয়া বলিলেন, তা-ই হউক মীরা, তোমাকে অসুখী দেখিতে পারিনা। এই রাজপুরীতে গোবিন্দজী স্থাপন করিয়া দেই, তুমি মেরতায় যেমন কীর্ত্তন করিতে, তাঁহার সম্মুখে তেমনই কর। আমি উহা শুনিয়াই সুখী হইব।

৬

চিতোরের পুরীর মধ্যে গোবিন্দজী স্থাপন করা হইল, মীরা তাঁহার সম্মুখে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

চিতোরের রাজ পরিবার শৈব; রাণা নিজে এক-লিঙ্গের দেওয়ান। রাজ পরিবারের সকলে বলিতে লাগিল, গোবিন্দজী স্থাপনে চিতোরের অশুভ হইবে। রাণা, প্রমাদে পড়িলেন। একদিকে মীরাপ্রেম, অন্য দিকে কুলধর্ম্ম, রাণা কোনদিক রক্ষা করিবেন, চিন্তিত হইলেন। বিষমে পড়িয়া রাণা, প্রত্যাদেশের জন্য এক-লিঙ্গের মন্দিরে হত্যা দিলেন।

মধ্য রাত্রিতে কুম্ভ স্বপ্ন দেখিলেন, সেই অনাদিলিঙ্গ রজত-শুভ্র পুরুষে পরিণত হইলেন, তাঁহার কপালে উজ্জ্বল চন্দ্র, মাথায় জটা, কণ্ঠে নীল। দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তির অর্দ্ধেক কাল হইল, অর্দ্ধেক মাথায় শিখিপুচ্ছের চূড়া, অর্দ্ধেক বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখা দিল। সে মূর্ত্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—দেখ দেওয়ান, এই আমরা হরিহর একাঙ্গ। তুমি দুই পৃথক্ ভাবিয়া ভুল করিয়াছ।

কুম্ভের তন্দ্রা ভাঙ্গিল। ভক্তিভরে একলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া রাণা ঘরে আসিলেন। মীরা তখনও শয়ন করিতে আসেন নাই, গোবিন্দজীর মন্দিরে তখনও কীর্ত্তন হইতে-

ছিল। কুম্ভ সেইখানে গেলেন। মীরার সহিত একাসনে বসিয়া গোবিন্দকীর্ত্তন গাইতে লাগিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে মীরা কহিলেন,স্বামিন্, আজ মীরার কীর্ত্তন সার্থক ; কিন্তু আপনি একলিঙ্গের দেওয়ান, গোবিন্দজীর সম্মুখে কীর্ত্তন করিলেন, রাজ পরিবারের সকলে কি বলিবে ?

রাণা—যাহার যাহা ইচ্ছা বলুক, মীরা। ভগবান একলিঙ্গই আদেশ করিয়াছেন—হরিহর এক।

শোন মীরা, আজ অনেক দিন পরে তোমাকে প্রফুল্ল দেখিলাম। তোমার কোন বাঞ্ছা থাকে ত বল, আমি পূর্ণ করিব।

মীরা—আপনার মুখে গোবিন্দ নাম শুনিয়া আমার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। স্বামিন্, আমাকে গোবিন্দের সম্মুখে কীর্ত্তন করিতে দিয়া সবই দিয়াছেন, আর কি চাহিব প্রভু ? তবে যদি বৈষ্ণবগণ অবাধে এখানে আসিতে পারেন, আরও আনন্দ হয়।

রাণা—তাহাই হইবে মীরা। বৈষ্ণবেরা অবাধে এখানে আসিতে পারিবেন। কাল, সে আদেশ দিব।

৭

মহারাণা আদেশ করিলেন—যে কোন বৈষ্ণব অবাধে গোবিন্দজীর মন্দিরে যাইতে পারিবে।

মীরাবাইর কীর্ত্তন শুনিবার জন্য এবং গোবিন্দজী দেখিবার জন্য প্রত্যহ বহু বৈষ্ণব গোবিন্দজীর মন্দিরে যাইতে লাগিল। মীরার আনন্দ উথলিয়া উঠিল। আবার যেমন মীরা তেমন হইলেন।

রাণা কুম্ভ নিজে কবি ছিলেন। অবসর কালে মীরাকে লইয়া গীতগোবিন্দের কান্ত পদাবলী গাইতেন, নূতন গীত রচনা করিয়া মীরার চিত্ত বিনোদন করিতেন।

কিন্তু এভাবে অনেক দিন গেলনা। একদিন রাণা গোবিন্দজীর মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, নানাদেশ হইতে বহু বৈষ্ণব সেখানে আসিয়াছে, মীরা সেই বৈষ্ণবগণের সমক্ষে গোবিন্দজীর সম্মুখে বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন আর সকল লোক অনিমিষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

রাণার ললাটের শিরা স্ফীত হইল। চিতোরের মহিষী—যাঁহাকে চন্দ্র সূর্য্য দেখিতে পায় না, সেই আজ সকলের সমক্ষে বসিয়া সাধারণ এক গণিকার ন্যায় গাইতেছে, আর সকলে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। হায়, কুহকিনীর মোহে পড়িয়া আমি বাপ্পারাওয়ের কুলে কালি দিলাম। ছি ছি কি করিয়াছি। রাণা, আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

রাণার মনে আজ একথা উঠিল। কিন্তু রাজপুরীতে

ইহা লইয়া অনেক দিন যাবৎ আলোচনা চলিতেছিল, কাণাকাণি হইতেছিল। যাহারা কুলপ্রথার অনুরাগী, সকলেই মহিষীর এ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রজারাও মহিষীর কথা লইয়া কাণাকাণি করিত।

রাণা আর মন্দিরে দাঁড়াইলেন না। শয়ন কক্ষে আসিয়া বিশ্বস্তা প্রহরিণীকে বলিলেন—তুই এখনই রাণীকে ডাকিয়া লইয়া আয়।

প্রহরিণী বলিল—তিনি গোবিন্দজীর মন্দিরে কীর্ত্তন করিতেছেন।

প্রহরিণী কি ভাবে একথা বলিল, সে-ই জানে; হয়ত সে মনে করিয়াছিল, কীর্ত্তনের কথা শুনিলে রাণা এখন ডাকিবেন না। অন্যদিন হয়ত তাহাই হইত। কিন্তু আজ রাণার চিত্ত অন্যরূপ। আজ কীর্ত্তনের কথায় তাঁহার দারুণ অপমান বোধ হইতে লাগিল। ক্রোধে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে মুখ দেখিয়া প্রহরিণী প্রমাদ গণিল, তাড়াতাড়ি গোবিন্দজীর মন্দির মুখে চলিয়া গেল।

মীরা, কীর্ত্তন করিতেছিলেন, প্রহরিণী তাঁহার নিকটে যাইয়া রাণার আদেশ জানাইল। মীরার, অর্দ্ধগীত রাগ

থামিয়া গেল। গোবিন্দজীকে প্রণাম করিয়া মীরা শয়ন প্রাসাদে গেলেন।

রাণা ডাকিলেন—মীরা,—

স্বর কর্কশ, ক্রোধ ও অভিমান পূর্ণ। মীরা আকুল-চিত্তে উত্তর করিলেন—স্বামিন্,

"তুমি এই চিতোরের মহিষী; বাপ্পারাওয়ের পবিত্র কুলের বধূ।"

"আদেশ করুন, মহারাণা।"

"এমনই ভাবে দেশ বিদেশের লোকের সমক্ষে সঙ্গীত করা, চিতোরের রাণীর পক্ষে শোভা পায় কি? যে চিতোরের মহিষীকে, চন্দ্র সূর্য্যে দেখিতে পায় না, হায়! আজ তাহাকে"—

ক্রোধে ও দুঃখে রাণা আর বলিতে পারিলেন না।

"মীরা, কুক্ষণে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, তোমার গান শুনিয়াছিলাম, তোমাকে ঘরে আনিয়াছিলাম। তুমি বাপ্পার কুলে কলঙ্ক দিলে।"

"আমার অদৃষ্টলিপি, মহারাণা।"

"তাই-ই ঠিক। আমি ভুল করিয়াছিলাম। এখন সে ভুল, সংশোধন করিতে হইবে। নহিলে কুম্ভের নামে লোকে ধিক্কার দিবে। বলিবে, একটা গণিকার

মোহে পড়িয়া কুম্ভ, চিতোরের রাজবংশে কলঙ্ক লেপিয়াছে।"

সেই মুহূর্ত্তে বজ্রাঘাত হইলেও বুঝি ভাল ছিল। মীরার হৃদয়ে বজ্রের অধিক ব্যথা লাগিল। ব্যাকুল কণ্ঠে মীরা কহিলেন :—

"স্বামিন্, মীরা—মীরা ; মহিষীও নহে, গণিকাও নহে। মীরা কি, জানেন গোবিন্দ, আর জানেন স্বামী কুম্ভ। মীরার প্রাণ, গোবিন্দের ; দেহ, কুম্ভের। মীরা, দেহ দিয়া স্বামীর সেবা, এবং মন দিয়া গোবিন্দের সেবা করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু দেহ মন এক করিয়া স্বামী-গোবিন্দের সেবা করিতে পারে নাই। মীরা, সাধন-ভ্রষ্টা পাপীয়সী ; তাহার মত হতভাগিনী কে আছে প্রভু ?

পত্নীর কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারিয়া মীরা অপ-রাধিনী হইয়াছে, প্রভু, দাসীর সে অপরাধ ক্ষমা করিও। তুমি যাহা বলিতে ডাকিয়াছ, বুঝিয়াছি। কাল প্রভাতে এ মুখ আর চিতোরের কেহ দেখিবেনা, মীরা কোথায় গেল কেহ জানিবে না। তোমাকে কলঙ্কী করিয়া মীরা বাঁচিতে চায় না।"

বলিতে বলিতে মীরা পতিকে প্রণাম করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

রাণা মীরার দিকে চাহিয়া একবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। একবার বলিতে চাহিলেন—মীরা যাইওনা। কিন্তু মুখে সে কথা উচ্চারিত হইলনা। মীরা চলিয়া গেল।

৮

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। নিশীথ কাল। চিতোরের জনপ্রাণী সকলেই প্রসুপ্ত ; রাজপুরী নীরব। এই সময়ে মীরা, সেই পুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন ; কেহ তাহাকে নিষেধ করিলনা, বাধা দিল না।

কোথায় যাইবেন লক্ষ্য নাই, পথ যে দিকে গিয়াছে, মীরা সেইদিকে চলিলেন। মন, বড়ই ভারাক্রান্ত ; বড়ই চিন্তাকুল। একবার গোবিন্দজীর এবং একবার রাণার মুখ মীরার মনে পড়িল, মীরা থমকিয়া পাছে ফিরিয়া চাহিলেন। কিন্তু অন্ধকার কেবলই অন্ধকার ; সেই অন্ধকারে পুরী বা মন্দির কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মীরা, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার চলিলেন।

এমনই ভাবে অনেকক্ষণ গেল। চিতোর ছাড়িয়া মীরা প্রান্তরে আসিলেন। প্রান্তরের পরে পর্ব্বত, পর্ব্বতের পরে এক খরস্রোতা নদী। মীরা, নদীর কূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

চারিদিকে দিগন্তবিস্তারী অচ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারে নদীর তীরে দাড়াইয়া মীরা ভাবিলেন, কোথায় যাই? আমার যাইবার স্থান কোথায়? আর যাইয়া প্রয়োজনই বা কি? গোবিন্দজীর সেবা করিতে পারিলাম না, রাণার সেবাও করিতে পারিলাম না। আমার দুই দিকই গেল। আর জীবনের প্রয়োজন কি? আমি জীবিত থাকিলেই রাণার কুলে কলঙ্ক পড়িবে, ছি ছি কি কথা। তাহা ঘটিতে দিবনা। আর জীবন রাখিবনা। রাণা ভুল করিয়াছিলেন, আমি ভুল করিব না। প্রভু গোবিন্দ, তোমাকে মন দিয়াছিলাম, সে মন নেও প্রভু। আর রাণা, স্বামিন্—এ দেহ তোমার; তুমি উপেক্ষা করিলে এ দেহে আর প্রয়োজন কি? এ পঞ্চভূতে গড়া মাংসপিণ্ড, পঞ্চভূতে মিশুক। এই বলিয়া মীরা, ঝাঁপ দিয়া সেই নদীর মধ্যে পতিত হইলেন। প্রখর স্রোত, তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। মীরা অজ্ঞান হইলেন।

৯

যখন জ্ঞান হইল, মীরা দেখিলেন, সূর্য্য উঠিয়াছে। নদী সৈকতে এক বর্ষীয়সী মহিলা তাঁহার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়াছে।

মীরাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া বৃদ্ধার মুখ প্রফুল্ল হইল। বৃদ্ধা, মীরাকে একখানি শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া দিলেন। তাঁহার ঝুলিতে কি ঔষধ ছিল, তাহা খাওয়াইলেন। মীরার দেহে বল আসিল, মীরা উঠিয়া বসিলেন।

বর্ষীয়সী কহিলেন মা, তোমাকে এই নদীর জলে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া তুলিয়াছি। কিরূপে জলমগ্ন হইয়াছিলে?

মীরা—আপনি ইচ্ছা করিয়া মরিবার জন্ম জলে পড়িয়াছিলাম, তুমি কেন মা আমায় বাঁচাইলে? আমার বাঁচিবার প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধা—দেবতারও আকাঙ্ক্ষিত এই সুঠাম দেহ, এই বয়স, এত নির্ব্বেদ হইল কেন মা? আত্মহত্যা যে মহাপাপ, তাহা কি জাননা মা?

মীরা—জানি মা। এ দেহ যাঁহাকে দিয়াছিলাম, তিনি আর ইহা চাহেন না। এ মন, যাঁহাকে দিয়াছিলাম, তাঁহাকে মনে করিয়াই ঝাঁপ দিয়াছিলাম।

বৃদ্ধা—মা, দেহ ও মন, দুইটি দুইজনকে দিয়াছিলে, একজনকে দিতে পার নাই? ভুল করিয়াছিলে মা।

মীরা—পারি নাই মা। আমার অদৃষ্ট এই ভুল ঘটাইয়াছিল।

বর্ষীয়সী এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মীরার দিকে চাহিলেন। মুহূর্ত্তকাল কি দেখিয়া যেন বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, তোমার হাতে চক্রচিহ্ন, তুমি যে রাজমহিষী। তোমার নাম কি মা?

মীরা—অভাগিনীর নাম মীরা।

বৃদ্ধা—ওঃ মীরাবাই। রাণা কুম্ভের মহিষী, গোবিন্দের সেবিকা? তুমি কোন্ দুঃখে মা আত্মহত্যা করিতেছিলে?

মীরা—মা, আমি মন দিয়াছিলাম গোবিন্দজীকে, দেহ, দিয়াছিলাম রাণাকে। আমি না হইলাম রাণী, না হইলাম বৈরাগিনী। আমার স্বামী সেবাও হইলনা, গোবিন্দ সেবায়ও বাধা পড়িল। আমার দুইদিক গেল মা।

বৃদ্ধা—কেন, তুমি ত ভাগ্যবতী। এমন করিয়া যে আপনাকে নিঃশেষ বিলাইয়া দিতে পারে, তার কি দুই দিক্ যায় মা?

মীরা—আমার মা দুই দিক্ই গেল।

বৃদ্ধা—কেন, স্বামী-গোবিন্দের সেবা করিলেইত পারিতে। স্বামীকে গোবিন্দ ভাবিয়া সেবা করিলে তোমার দুই দিকই থাকিত। দেহ ও মন এক জায়গায় বিকাইতে পারিতে।

মীরা—সে কথা আগে বুঝি নাই। ভাবিতাম, গোবিন্দ এক, আর স্বামী এক; তাই মন দিয়া গোবিন্দের আর দেহ দিয়া স্বামীর সেবা করিতে চাহিতাম। আমার বুঝি দুই-ই বিফল হইল। দেহের সেবায় স্বামীকে তুষ্ট করিতে পারিলাম না. তিনি এ দেহ উপেক্ষা করিয়াছেন।

যাহার জিনিষ, তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন, আর রাখিবার প্রয়োজন কি? তাই, জলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম। তুমি আমায় উঠাইলে কেন মা? এ দেহ দিয়া কি করিব?

বৃদ্ধা—মা, ভুল করিয়াছ. এমন দেহ বহু তপস্যায় হয়। এ দেহ কি এমন করিয়া ফেলিতে আছে মা? মানুষের ভোগে যাহা দিতে চাহিয়াছিলে, তাহা এখন দেবতার ভোগে লাগাও। তুমি স্বামি-গোবিন্দের সেবা করিতে পার নাই, এখন গোবিন্দ-স্বামীর সেবা কর। গোবিন্দই তোমার রাণা হইবেন।

মীরা—তুমি কে মা?

বৃদ্ধা—আমি বৈরাগিনী, নাম-গোত্র-গৃহহীন। আমার বলিবার এ দুনিয়ায় আমার কিছু নাই। বৃন্দাবনে দেহ রাখিতে যাইতেছি। তুমিও চল। সেই প্রেমের ক্ষেত্রে যাইয়া কায়মনে গোবিন্দ-স্বামীর সেবা কর। গোবিন্দও

মিলিবে, স্বামীও মিলিবে, দুই কুল আবার ফিরিয়া পাইবে মা।

মীরা—চলুন, যাইব।

মীরা উঠিলেন। গলায় বহুমূল্য হার তখনও ছিল, উহা খুলিয়া নদীর জলে ফেলিবার জন্য হাতে লইলেন।

বৈরাগিনী বলিলেন, হার কি করিবে মা?

"জলে ফেলিব।"

"কেন?"

"উহার প্রয়োজন দেখি না।"

"প্রয়োজন আছে মা, ফেলিওনা। এখনও তোমার দেহ আছে, কাজেই দেহ রক্ষার জন্য আহার ও পরিচ্ছদের প্রয়োজন আছে, নহিলে দেহ থাকিবে না। দেহ না থাকিলে কি দিয়া গোবিন্দভজন করিবে, স্বামী সেবা করিবে?"

বৃন্দাবনে মাধুকরী করিব।"

"তা পারিবেনা মা। তোমার যে রূপ, এ রূপ লইয়া ভিক্ষা করা চলে না। এ বয়সেও না। তার পর তুমি রাজার মেয়ে রাজার মহিষী, ভিক্ষার ক্লেশ সহিতেই বা পারিবে কেন? ক্লিষ্ট শরীরে কৃষ্ণভজন হয় না মা।

হার রাখ। এই হার তোমার ভজনের সহায় হইবে,

ইহার মূল্যে বৃন্দাবনে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাণীর মত থাকিয়া গোবিন্দ রাজার সেবা করিও।

১০

মীরা বৃন্দাবনে আসিলেন। মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। মূর্ত্তির নাম রাখিলেন রাণা-গোবিন্দ। উহাই মীরার গোবিন্দ স্বামী এবং স্বামি গোবিন্দ হইলেন।

মীরা গোবিন্দের গলায় মালা পরাইয়া ভাবেন কৃষ্ণের গলায় দিলাম। কৃষ্ণের নামে ভোগ নিবেদন করিয়া গোবিন্দের সম্মুখে দেন। মীরা, শ্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া একবার ডাকেন রাণা, আবার ডাকেন গোবিন্দ। মীরার রাণা ও গোবিন্দ, স্বামী ও দেবতা এক হইয়া গেল।

মীরার চিত্তের ভার দূর হইল, আবার আনন্দ ফিরিয়া আসিল। রাণা-গোবিন্দের সম্মুখে বসিয়া মীরা দিবারাত্রি কেবলই মধুর ঝঙ্কারে আত্ম নিবেদন করেন। তাঁহার সে মধুর সঙ্গীতে বৃন্দাবন পুলকিত হইয়া উঠিল। বৃন্দাবনের পথে পথে "রাধে রাধে" ধ্বনির সহিত ব্রজবাসীরা গাইতে লাগিল :—

"মীরা কহে বিনা প্রেমসে নেহি মিলে নন্দলালা।"

মীরার মধুর মোহন মূর্ত্তি, ভগবৎ প্রেমের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। সে মূর্ত্তি যে

দেখিত, সেই-ই অভিভূত হইত। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-দিগের বিশ্বাস হইল, প্যারীজী, আবার প্রকট হইয়া গোবিন্দের সেবা করিতেছেন। বাইজীই প্যারীজী।

তখন বৃন্দাবন, অরণ্য। জন কতক, বিরক্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণব ও সাধক, সেই অরণ্যের মধ্যে যাইয়া লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ও ভক্তি শাস্ত্রের প্রচারের জন্য তপস্যা করিতে-ছিলেন। রূপ গোস্বামী তাঁহাদের প্রধান।

রূপ, পরম পণ্ডিত। একদিন রূপ, গৌড়ের বাদশাহের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু বিষয় ভোগ তাহার ভাল লাগিল না। মন্ত্রিত্ব ফেলিয়া প্রেমাবতার চৈতন্যের শরণ লইলেন। চৈতন্যের আদেশে কাঁথা ও কৌপিন লইয়া বৃন্দাবনে আসিলেন।

রূপের বৈরাগ্য, অতুলনীয়! 'হাতে করোয়া' গাত্রে কান্থা, পরিধানে ছিঁড়া বহির্ব্বাস—রূপ, একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি বাস করেন। ভয়, দুই রাত্রি এক বৃক্ষের তলে থাকিলে পাছে সেই স্থান টুকুর জন্য মায়া জন্মে।

মীরা, এই বিরক্ত বৈরাগীকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণের নিমন্ত্রণ করিবার জন্য দাসী পাঠাইয়া দিলেন।

দাসী যাইয়া দেখিল, রূপ এক বৃক্ষতলে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া বসিয়া কি লিখিতেছেন। তাঁহার স্নিগ্ধ গম্ভীর মুখশ্রীর দিকে চাহিতে দাসীর শরীর কাঁপিতে লাগিল। দাসী করযোড়ে বলিল—ঠাকুর, আজ আমাদের ঠাকুরাণী, আপনাকে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

রূপ, মাথা না তুলিয়াই বলিলেন—ঠাকুরাণী কে ?

দাসী বলিল—বাইজী।

রূপ বলিলেন—বাইজীকে বলিও,

"কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিক হরে মুনেররূপি মন।"

কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়াও মুনির পতন হইতে পারে। আমি বৈরাগী, যোষিৎগৃহে গমন, যোষিৎ দর্শন আমার নিষিদ্ধ।

দাসী আসিয়া জানাইল। মীরা হাসিলেন, বলিলেন তুই আবার যা, গোঁসাইকে বল, এ দেহে যিনি বাস করেন, তিনি স্ত্রী কি পুরুষ? আর, শুনিয়াছি, এই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সবই প্রকৃতি। গোঁসাই যদি পুরুষ তবে তাঁহার বৃন্দাবনে প্রবেশ করা সঙ্গত হয় নাই।

দাসী যাইয়া বাইজীর কথাগুলি, রূপ গোস্বামীকে

বলিল। গোস্বামী চমকিত হইলেন ; ঘোর অন্ধকারে সহসা বিদ্যুৎ জ্বলিলে যেমন হয়, তেমন হইল। রূপ দন্তে তৃণ লইলেন, অশ্রুতে তাঁহার বদন ভাসিয়া গেল। হায়, করিয়াছি কি? আমার যে, দেহাত্মবুদ্ধি এখনও যায় নাই, কি বৈরাগ্য করিতেছি? আমি ত দেহকেই বুঝিতেছি আমি। নহিলে কেন, আমি আমাকে পুরুষ মনে করিব, বাইজীকেই বা যোষিৎ বলিব কেন?

রূপ, এবার মাথা তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, আমার অপরাধ হইয়াছে। বাইজী আমার অজ্ঞান-তিমির দূর করিলেন। বলিও, তিনি আমার গুরু, আমি ভিক্ষা স্বীকার করিলাম।

১১

মীরা ঘরের বাহির হইলেই রাণার মনে হইল, হায় এ করিলাম কি? সত্যই কি মীরা গেল? হায়, কেন তাহাকে বারণ করিলাম না? কেন এমন কথা বলিলাম? মীরার অপরাধ কি? সে ত বাল্যাবধি যেমন ছিল, তেমনই আছে। বিবাহের পূর্ব্বেইত মীরা আমাকে বলিয়াছিল, দেহ আমাকে দিবে কিন্তু মন দিতে পারিবে না, মন, গোবিন্দজীকে দিয়াছে। আমিই সে কথা বুঝিলাম না। রূপের মোহে, স্বরের মোহে, ভোগের

লোভে আমার ভুল হইল। আমি বন-বিহঙ্গীকে খাঁচায় পুরিতে গেলাম। তাতে পাখীরও সুখ হইল না, আমারও না। আজ আপনি আবার খাঁচা ভাঙ্গিয়া দিলাম, পাখী উড়িয়া গেল, আর কি আসিবে?

না—না, মীরা এখনই ফিরিবে। এই গভীর রাত্রি, এই অন্ধকার, মীরা কোথায় যাইবে? হায় রাণা, মীরার মনের মধ্যে তখন যে কত অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছিল, যদি তাহা দেখিতে পাইতে, তাহাহইলে বুঝিতে পারিতে বাহিরের এ অন্ধকারে মীরার পথ রোধ করিতে পারিবেনা।

রাণা, উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। পাতাটি নড়ে, রাণা ভাবেন, ঐ মীরা আসিতেছে। বাতাস শো শো করিয়া চলিয়া যায়, রাণা ভাবেন মীরা আসিল। কিন্তু মীরা আর আসিলনা। রাণা সারারাত্রি বসিয়া কাটাইলেন, জাগরণে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রভাতে চারিদিকে লোক ছুটিল, কিছুকাল পরে ফিরিয়া আসিল, কেহই মহিষীর সংবাদ আনিতে পারিলনা। রাণার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, চক্ষুদিয়া দরদর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। হায় মীরা, কোথায় তুমি?

রাণা, গোবিন্দের মন্দিরে গেলেন। যেখানে বসিয়া মীরা, গোবিন্দজীকে গীত শুনাইতেন, সেখানে সেই আসন তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু আসনে যে বসিত, সে নাই। গোবিন্দ মূর্ত্তি তেমনই আছে, মন্দির তেমনই আছে, কিন্তু মন্দিরে যে স্বরলহরী তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিত, সে স্বরলহরী নাই। মন্দির নীরব। রাণা আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না। শয়ন কক্ষে আসিলেন। কিন্তু সেখানে মরালের ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া যে প্রতিমা দাঁড়াইয়া থাকিত, সে প্রতিমা কই? রাণা, শয়ন কক্ষে থাকিতে পারিলেন না, দরবার গৃহে আসিলেন। দরবার ভাল লাগিল না, উদ্যানে গেলেন।

উদ্যানে ফুল ফুটিয়াছে,রাণা দেখিলেন সে ফুলে মীরার কান্তি; কোকিল ডাকিতেছে, সে যেন মীরারই কণ্ঠধ্বনি; লতা দুলিতেছে, সে যেন মীরার অঞ্চল সঞ্চালন। রাণা, বাগানেও থাকিতে পারিলেন না। হায় মীরা, কোথায় তুমি, একবার এস।

কিন্তু মীরা আসিলনা, তাহার কোন অনুসন্ধানও পাওয়া গেলনা। দিন গেল, রাত্রি আসিল। মন্দিরে সন্ধ্যা আরতির কাঁশ বাজিয়া উঠিল। রাণা, ছুটিয়া গোবিন্দের মন্দিরে গেলেন, যদি এ সময়ে সে মন্দিরে

আসে, সে যে গোবিন্দজীকে গান না শুনাইয়া থাকিতে পারেনা। কিন্তু আরতি হইয়া গেল, কেহ আসিলনা। মন্দির নীরব, আজ কেহ গাইল না, কে গাইবে? যে গাইত, সে যে নাই। রাণা, চক্ষু মুছিয়া শয়ন কক্ষে আসিলেন।

দূরে কে গাইতেছিল—"মীরা কহে"; রাণা কাণ-পাতিয়া সে গান শুনিলেন। আজ এ গীত বড় মিঠা, মীরা অভাবে "মীরা কহে" বড় মিঠা। রাণা, আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন- হায় এত মিঠা যাঁর কথা, তাঁকে সময় থাকিতে চিনিলাম না, একে আর বুঝিলাম। দুর্ব্বাক্য বলিলাম, অভিমানে—হায় হায় অভিমানে সে চলিয়া গেল!

সেইদিন রাত্রিতে রাণা স্বপ্ন দেখিলেন—মীরা, বৈকুণ্ঠের দরজায় দাড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে। মীরা স্নিগ্ধ হাস্যময়ী; মীরা ডাকিতেছে—এস স্বামিন্, তুমিই আমার গোবিন্দ; তোমাকে দেহ দিয়াছিলাম, মন দিতে পারি নাই। আজ গোবিন্দকে বলিয়া মন ফিরাইয়া আনিয়াছি, এই লও। মীরা, হাত বাড়াইয়া কি দিল, রাণা যেমন ধরিবেন, অমনি নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

আবার দেখিলেন, ভবানী দশভুজা মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া

বলিতেছেন—দেওয়ান, করিয়াছ কি ? সমগ্র রাজপুতনার শ্রী, তোমার ঘরে আসিয়াছিল, তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছ ? রাণা ভীত হইয়া জাগরিত হইলেন।

এমনই ভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস গেল। মীরা আসিল না, মীরার সন্ধান মিলিল না। চিতোরের সকলে বুঝিল, মীরা মরিয়াছে কি আত্মহত্যা করিয়াছে।

১২

মীরা মরিল, কিন্তু মীরার স্মৃতি মরিল না, মীরার সঙ্গীত মরিলনা। ঘাটে, মাঠে, মন্দিরে, পথে দিবারাত্রি লোকে "মীরা কহে" গাইতে লাগিল। বাঁচিয়া মীরা ছিলেন একস্থানে, মরিয়া মীরা সর্ব্বত্র ব্যাপিনী হইলেন।

রাণার নিকট মীরার স্মৃতি মিঠা, মীরার সঙ্গীত মিঠা। কুম্ভ মীরার সঙ্গীত সংগ্রহ করিলেন। সে সঙ্গীত প্রত্যহ, গোবিন্দজীর মন্দিরে গীত হইবে, আদেশ করিলেন।

মন্দিরে মীরা নাই, কিন্তু মীরার গান আছে। সে গান শুনিতে রাণা প্রত্যহ মন্দিরে যাইতে লাগিলেন। মীরা নাই, মীরার প্রতিষ্ঠিত সাধু বৈষ্ণবের সেবা আছে, রাণা নিজে যাইয়া তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। শয়ন কক্ষে মীরা নাই, মীরার পট আছে, রাণা নিত্য অশ্রুজলে সে পট ধুইতে লাগিলেন।

চিতোর ছাড়িয়া মীরা, চিতোরেশ্বরী হইলেন। মন্দিরে মন্দিরে মীরার গান, পথে ঘাটে মীরার কথা, গৃহে গৃহে মীরার কীর্ত্তন। চিতোর ভরিয়া ধ্বনি—"মীরা কহে"। গোঠের রাখাল, ক্ষেত্রের কৃষকের কণ্ঠেও সে ধ্বনি হইতে লাগিল। রাণা, "মীরা কহে" শুনিয়া মীরার অভাবে দিন কাটিতে লাগিলেন।

১৩

একদিন রাজপথে এক ভিখারী গাইয়া যাইতেছিল —"জীবন মন তুঁহু শ্যাম।" রাণা সে গান শুনিলেন ইহার শেষে সেই "মীরা কহে"। কিন্তু এ গীত যে নূতন। রাণা আর কখনও শুনেন নাই, চিতোরের কেহ শুনে নাই।

রাণা ভিখারীকে ডাকাইলেন। আবার গানটি শুনিলেন। তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধু, তুমি এ গীত কোথায় শিখিয়াছ?

"মহারাণা, বৃন্দাবনে শিখিয়াছি। সেখানে প্যারীজী, প্রকট হইয়াছেন। তিনি নিত্য নূতন গীত গাইয়া গোবিন্দের সেবা করেন। এ, তাহারই গান।"

"প্যারীজীকে লোকে কি বলে?"

"তাঁহাকে কেহ বলে, বাইজী, কেহ বলে রাণীজী

তিনি আপনাকে বলেন 'মীরা'। এই দেখুন না গানের শেষে আছে—"মীরা কহে।"

"হাঁ, বুঝিয়াছি।"

রাণা, ভিক্ষুককে প্রচুর ভিক্ষা দিলেন। সঙ্গীত শুনিয়া ও ভিক্ষুকের কথায় রাণা বুঝিলেন, মীরা মরেন নাই, বৃন্দাবনে আছেন। সেখানে গোবিন্দ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সেবা করিতেছেন। কিন্তু বিগ্রহের নাম রাণা-গোবিন্দ, এমন নামত কখনও শুনি নাই।

রাণা, ছদ্মবেশে সেই দিনই বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৪

বৃন্দাবনে বাইজীর কুঞ্জ। মন্দিরে মোহনমূর্ত্তি রাণা গোবিন্দ। বাইজী, ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া আপনার রচিত গীত ঠাকুরকে শুনাইতেছেন।

সন্ধ্যাকাল। দুইজন অতিথি, মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া সে গীত শুনিতেছিল। গীত শুনিয়া একজনের অশ্রুপাত হইতেছিল।

যাঁহার অশ্রুপাত হইতেছিল, তিনি রাণা কুম্ভ, অপর তাহার সহযাত্রী। রাণার বৈষ্ণব বেশ, সহজে তাঁহাকে চিনিবার উপায় নাই।

গীত সমাপ্ত হইল। বাইজী, ঠাকুরের দিকে চাহিয়া করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, ঠাকুর, তুমিই আমার গোবিন্দ, তুমিই আমার রাণা। আমার সময় শেষ হইয়া আসিল, প্রভু একবার যদি এ সময়ে কেবলই রাণা হইয়া দেখা দিতে, মীরার জন্ম সার্থক হইত। প্রভু, নারী হইয়া জন্মিয়াছিলাম, এ জন্ম সার্থক কর, তুমি আমার গোবিন্দ, আমার রাণা হইয়া প্রকট হও।

অতিথি বৈষ্ণবেরা এ প্রার্থনা শুনিলেন। রাণার হৃৎকম্প হইতে লাগিল।

বাইজী, ঠাকুর প্রণাম করিয়া মন্দিরের ঘরে আসিলেন। এমন সময়ে ছদ্মবেশী রাণা তাঁহার সম্মুখে যাইয়া বলিলেন—রাণীজী, কিছু ভিক্ষা চাই।

মীরা—কি ভিক্ষা বলুন। আমি রাণী নই, ভিখারিণী।

রাণা—তা, হউক, আমি যাহা চাহিব, তাহা আপনার আছে।

মীরা—তবে, বলুন।

রাণা গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন,—ক্ষমা।

সেই সময়ে বাহিরে বিদ্যুৎ চমকিল, সেই আলোকে মীরা, ভিখারীকে ভাল করিয়া দেখিয়া, চিনিলেন। তাঁহার হৃদয়েও বিদ্যুৎ চমকিল।

"স্বামিন্, এতদিন পরে দয়া করিলে?"—এই বলিয়া মীরা, কুম্ভের পদতলে পতিত হইলেন।

কুম্ভ, মীরাকে ধরিয়া উঠাইয়া আকুল স্বরে কহিলেন—মীরা, আমার মীরা—আর কুম্ভের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইলনা. আর কিছু বলিতে পারিলেন না। কিছুকাল উভয়েই নীরব রহিলেন। তাহার পরে মীরা কহিলেন—এসেছ, দাসীর জন্ম সার্থক করিতে এসেছ, তবে এস—এই বলিয়া কুম্ভের হাত ধরিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

আপনি যে আসনে রাণা-গোবিন্দের সম্মুখে বসিতেন, মীরা, কুম্ভকে সেই আসনে বসাইলেন। তাহার পরে একবার গোবিন্দের মূর্ত্তি একবার রাণার মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ সংজ্ঞাহীনা হইয়া দুইয়ের মধ্যে পতিত হইলেন।

কুম্ভ ডাকিলেন—মীরা, আমার মীরা—কেহ উত্তর দিলনা।

জন্ম সার্থক করিয়া মীরা, রাণা ও গোবিন্দের সম্মুখে দেহ ত্যাগ করিলেন।

সনাতন গোস্বামী।

১

বর্ষার রাত্রি। গৌড়ে সে দিন অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছিল। পথে পথে জল দাড়াইয়াছে। ঘোর অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। সে সূচীভেদ্য অন্ধকারে আপনার শরীরও আপনি দেখিতে পাওয়া যায় না।

নিশীথ সময়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে দুইটী মনুষ্য গৌড়ের এক অপ্রসর পথ দিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে যাইতেছিল। পথের জল ও কাদার মধ্যে তাহাদের পদক্ষেপে ছপ্ ছপ্ শব্দ হইতেছিল। মনুষ্য দুইটি যাইতে যাইতে এক মেথরের ঘরের নিকট আসিল। সেখানে জল ও কাদা একটু বেশি, পায়ের শব্দও একটু বেশি হইল।

এই সময়ে বৃষ্টি বেগে আসিল। মনুষ্য দুইটি আশ্রয় লইবার জন্য মেথরের ঘরের দেয়াল ঘেসিয়া দাঁড়াইল।

মেথর ও মেথরাণী তখনও ঘুমায় নাই। শুইয়া শুইয়া গল্প করিতেছিল। পায়ের শব্দ পাইয়া মেথরাণী বলিল, বল দেখি কে যায়? মেথর বলিল—হয় কুকুর, নয় বাদশার চাকর। নহিলে এ অন্ধকারে আর কে যাইবে?

যাহারা যাইতেছিল, কথা টা তাহাদের কাণে গেল। একজন সে কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পরে মনে মনে বলিতে লাগিল—মেথর ঠিক বলিয়াছে, চাকর আর কুকুর ছাড়া এ সময়ে কে পথ চলে ?

যাহারা যাইতেছিল, সত্যই তাহারা বাদশার চাকর। একজন—রাজমন্ত্রী সাকর মল্লিক ; অপর ব্যক্তি রাজ প্রাসাদের বিশ্বস্ত খোজা প্রহরী। প্রহরী, বাদশার হুকুমে রাজমন্ত্রীকে ডাকিতে গিয়াছিল। কাজ,—জরুরী, গোপনীয় মন্ত্রণা ; গোপনে আসিতে হইবে। তাই, সাকুর মল্লিক, আর সঙ্গী বা যান বাহন না লইয়া প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গোপনে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে চলিয়াছেন।

এমন সময় আসে, যখন একটা সামান্য কথা মানুষের মর্ম্মস্থানে আঘাত করিয়া জীবনের পট একবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। মেথরের কথা, সাকর মল্লিকের মর্ম্মে সেইরূপ আঘাত করিল।

মল্লিক, রাজপ্রাসাদে গেলেন, মন্ত্রণা করিলেন, তাহার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু আজ চিত্ত বড় বিষণ্ণ। তাঁহার কর্ণে কেবলই মেথরের সেই কথা—হয় চাকর নয় কুকুর—ধ্বনিত হইতেছিল।

সে রাত্রিতে সাকর মল্লিকের নিদ্রা হইল না। এত

প্রভুত্ব, এত বড় পদমর্য্যাদা, সবই শূন্যগর্ভ ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

২

সাকর মল্লিক, দবীরখাস ও অনুপম মল্লিক, তিন ভাই; গৌড়ের নিকটে রামকেলি গ্রামে ইহাঁদের নিবাস। হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াও বড় দুই ভাই—সাকর মল্লিক ও দবীরখাস—আহারে পরিচ্ছদে ও নামে মুসলমানের মত হইয়া গিয়াছেন। গৌড়ের লোকে ইহাঁদিগকে মুসলমান বলিয়াই জানে। ইহাদের সনাতন ও রূপ নাম, বড় কেহ জানে না। বাদশাহ নাম রাখিয়াছেন সাকরমল্লিক ও দবীরখাস, ইহাঁরা এই নামেই পরিচিত। অনুপম মল্লিক, অনেকটা হিন্দুর মত; তাঁহার বল্লভ নাম, সকলেই জানে।

অনুপম, রামকেলিতে থাকেন, বিষয় কর্ম্ম করেন না। রামকেলিতে মল্লিক দিগের বাদশাহী প্রাসাদের মত বৃহৎ অট্টালিকা, দূর হইতে দেখা যায়।

অন্য দুই ভাই—সাকর মল্লিক ও দবীরখাস, গৌড়ের বাদশাহের মন্ত্রী। ইহাঁদিগকে গৌড়ে থাকিয়া রাজকার্য্য করিতে হয়।

'ম্লেচ্ছজাতি' 'ম্লেচ্ছসেবী' এবং 'ম্লেচ্ছকর্ম্মী' হইলেও

তিন ভাই-ই হিন্দু শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত। সাকর মল্লিক ও দবীরখাস আবার কেবল পণ্ডিত নহেন, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ।

তখন 'হজরতে আলা' সৈয়দ হোসেন শা গৌড়ের সুলতান। হোসেন শা বাল্যকালে 'গৌড়ের অধিকারী' সুবুদ্ধি রায়ের চাকর ছিলেন। সে কালে বাদশাহের অধীন এক একটি চাকলার শাসন কর্ত্তাকে 'অধিকারী বলিত। সুবুদ্ধি রায় গৌড়ের বাদশার একজন অধিকারী ছিলেন। হোসেন, বিপদে পড়িয়া বাল্যকালে ইহাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বাল্যে হিন্দুর প্রতিপালিত বলিয়াই হউক কি উচ্চতম সৈয়দ বংশের গুণেই হউক, হোসেন শা অপক্ষপাতী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য ছিলনা। রাজ্যের অনেক বড় বড় পদে হিন্দুরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর ন্যায়দর্শন ও স্মৃতি, বাঙ্গালীর তন্ত্র শাস্ত্র,—এক কথায় বলিতে গেলে বাঙ্গালীর প্রতিভা, হোসেন শার রাজত্বেই শেষবার বিকশিত হইয়াছিল। মুসলমান অধিকার কালে বাঙ্গালার এমন সৌভাগ্য আর কখনও দেখা যায় নাই।

হোসেন শাহ, গুণগ্রাহী ছিলেন। হজরত মহম্মদের পবিত্রবংশে তাঁহার জন্ম, তিনি কোন ধর্ম্মের প্রতিই অবজ্ঞা দেখাইতেন না, অত্যাচার করিতে দিতেন না। রূপ ও সনাতনের গুণের করিচয় পাইয়া হোসেন শাহ, উহা-দিগকে দবীরখাস ও সাকর মল্লিক নাম দিয়া মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। দুই ভাই, সুলতানের দক্ষিণ হস্ত, এবং গৌড়-সাম্রাজ্যসৌধের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। খাস দরবারের যত কাজ যত মন্ত্রণা, সুলতান এই দুই ভাইকে, বিশেষতঃ সাকর মল্লিককে লইয়া করিতেন।

সাকর মল্লিক, গৌড় ছাড়িয়া কোথায় যান না, কেন না, তাহাকে ছাড়িয়া মন্ত্রণার কাজ চলেনা। দবীরখাস, কখন কখন চাকলার শাসনকর্ত্তা হইয়া চাকলায় যান, আবার প্রয়োজন পড়িলে—বাদশাহ ডাকিলে—গৌড়ে আসেন।

গৌড়ে গঙ্গাতীরে রূপ সনাতনের বাসা। কি বাসায় কি বাড়ীতে, কোথায়ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর, প্রভুত্বের পরিচয়, ভোগের আয়োজন অল্প নহে। কিন্তু অতি-ভোগে শেষে বিতৃষ্ণা আনে, রূপ ও সনাতনের মনেও এই বাদশাহী ভোগে শেষে বিরক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল।

৩

যখন হোসেন শা গৌড়ের সুলতান, সাকর মল্লিক ও দবীরখাস তাঁহার মন্ত্রী ; বাঙ্গালার সেই সৌভাগ্যের সময়ে নবদ্বীপে প্রেমের বাণ ডাকিয়া উঠিল। সে প্রেমের প্রবাহ শান্তিপুর ডুবু ডুবু করিয়া, নদীয়া ভাসাইয়া—জাতি-ধর্ম্মের প্রাচীর ভাঙ্গিল, উচ্চনীচের ভেদ ধুইয়া ফেলিল, সকলকে হরিনামে মত্ত করিয়া তুলিল।

দবীর খাস শুনিলেন, নদীয়ায়, রাধা-ভাবের অবতার হইয়াছে। এক গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী, অতি পামরকেও কীর্ত্তন-যজ্ঞে অধিকার দিয়া পবিত্র করিয়া লইতেছেন। তাঁহার অশ্রুজলে পাষাণ গলে, নৃত্যে ভুবন পবিত্র হয় ; আলিঙ্গনে পাপী, পুণ্যজীবন লাভ করে। ভক্তি শিখাই-বার জন্য ভগবান্, ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

দবীরখাস, চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লইলেন। তাহার পরে পত্রের পর পত্র লিখিয়া গৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। পত্রে লিখিলেন—আপন কর্ম্মক্রমে আমরা বিষয় বিষ্ঠার গর্ত্তে পড়িয়া রহিয়াছি, আমাদিগকে হাত ধরিয়া তুলিবে তুমি বই আর এমন কেহ নাই। আমরা ঘৃণ্য, নীচজাতি ও নীচসঙ্গী। তুমি যদি নিজগুণে এ পতিত-দিগকে উদ্ধার না কর তবে আর ইহাদের উদ্ধার নাই।

গৌড়ের মন্ত্রী, দবীরখাস ও সাকর মল্লিকের নাম বঙ্গদেশে বিখ্যাত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যও উহাঁদিগকে জানিতেন। সেই দুই পরম পণ্ডিত যখন আর্তি ও বেদনা জানাইয়া উদ্ধার প্রার্থনা করিল, তখন কি আর পতিত পাবন থাকিতে পারেন? বৃন্দাবন যাইবার ছলে চৈতন্য রামকেলি আসিতে লাগিলেন।

চৈতন্যের সঙ্গে লোকারণ্য। সেই অসংখ্য লোকের কেহ হাসে, কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ কাঁদে। সন্ন্যাসী কাহাকেও ডাকেন না, লোক আপনি আসিয়া যুটে; সন্ন্যাসী, বলেন, ভাই সব হরি বল,-- আর অমনি লক্ষ লোক একসঙ্গে হরিধ্বনি করে।

হোসেন শাহ শুনিলেন এক সন্ন্যাসী গৌড় অভিমুখে আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে লক্ষ লোক। শাহ, বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বিনা দানে—কিছু না পাইয়াও—যাহার পাছে এত লোক আসে, সে সন্ন্যাসী, সামান্য লোক নহে।

বাদশা, কেশব ছত্রীকে বলিলেন—ছত্রী, তুমি যাইয়া সংবাদ জানিয়া আইস, আর কাজিদিগকে জানাইয়া দাও, কেহ যেন, ইহাঁর স্বচ্ছন্দগতিতে বাধা না দেয়।

ছত্রী, অগ্রসর হইয়া দেখিল, বিশাল জনসঙ্ঘ সেই গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া অগ্রসর হইতেছে। এত

লোকের কথা বলিলে বাদশা কি মনে করেন, কোন দুষ্ট লোক পাছে সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার বক্রভাব জন্মাইয়া দেয়,—এই সকল ভাবিয়া কেশব ছত্রী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—জাহাঁপনা, এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছে, তাহাকে দেখিবার জন্য গ্রাম্যলোক পাছে পাছে আসিতেছে ; বিশেষ কিছু নহে।

বাদশাহকে এই সংবাদ দিয়া কেশব ছত্রী, এক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া চৈতন্য দেবকে শীঘ্র শীঘ্র গৌড় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। ছত্রীর ভয়, কি জানি বাদশা মুসলমান, সন্ন্যাসীর এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া পাছে কোন অনিষ্টের চেষ্টা করেন।

সুলতান কিন্তু অনিষ্টের চেষ্টা দূরে থাকুক, দবীর-খাসকে নিভৃতে ডাকিয়া নিয়া সন্ন্যাসীর মহিমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দবীরখাস আপনার বিশ্বাস কিছু-মাত্র গোপন না করিয়া বলিলেন—জাহাঁপনা, "যে প্রভু, আপনাকে এই রাজ্যের সুলতান করিয়াছেন, তিনি আপনার সৌভাগ্যে আপনার রাজ্য এই গৌড় দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি আপনার মঙ্গল বাঞ্ছা করেন, আশীর্ব্বাদ করেন। ইহাঁর আশীর্ব্বাদে আপনার সর্ব্বত্র জয় হইবে। আপনি রাজা, বিষ্ণুর অংশ ; আমাকে

কেন ইহাঁর কথা জিজ্ঞাসা করেন? আপনার মনে যাহা লয়, তাহাই সত্য।

বাদশা কহিলেন—দবীরখাস, এত লোক যাঁহার সঙ্গে বিনা অর্থে চলে, তিনি মনুষ্য নহেন।

এদিকে চৈতন্য দেব, সেই জনসঙ্ঘ লইয়া হরি নাম করিতে করিতে রামকেলিতে গেলেন। তখন অপরাহ্ণ।—ধীর সমীরে ও গ্রামপ্রান্তের আম্রকাননের শ্যামচ্ছায়ায় প্রকৃতি স্নিগ্ধ ও শান্ত। অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণকিরণে সেই স্নিগ্ধ প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী।

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী সেই আম্র কাননের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া একবার গৌড়ের দিকে চাহিলেন। কি ভাবিলেন, কাহাকে চাহিলেন, কেহ বুঝিল না। তাহার পরে এক আম্র বৃক্ষতলে বসিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। রাত্রি হইল।

রাত্রির প্রথম প্রহর গেল, সন্ন্যাসী যেমন বসিয়াছিলেন, তেমনই আছেন। যেন, কাহারও আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন কিন্তু কেহ আসিল না।

আরও এক প্রহর গেল। বিশ্ব নীরব হইয়া পড়িল; দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। এমন সময়ে দুইটি পুরুষ দন্তে তৃণ লইয়া সন্ন্যাসীর পদতলে আসিয়া পড়িলেন।

তাঁহাদের দৈন্য, বিনয়, আর্ত্তি, আকুলতা ও অশ্রুজলে সেই উদাসীনকেও একবারে বিগলিত করিল। মহা প্রভু, কাতর স্বরে কহিলেন—দবীরখাস, তোমার দৈন্যে আমার বুক ফাটিয়া যায়, আর দৈন্য করিওনা।

আজি হইতে তোমাদের নাম রূপ ও সনাতন হইল। তোমাদের আর পাতিত্য নাই, কৃষ্ণের কৃপায় তোমরা পবিত্র হইয়াছ।

শোন রূপ, ভ্রষ্টা স্ত্রী সংসারের সকল কাজই করে কিন্তু সকল সময়েই তাহার মনটি থাকে কেবলই নায়কের দিকে। তেমনই বিষয় কর্ম্ম যাহা করিতেছ কর, কিন্তু মনটি রাখিও কেবল ভগবানের দিকে। তবেই ভোগ শেষ হইয়া আসিবে। ভোগ শেষ হইলে বিষয় বাসনা আপনি টুটিয়া যাইবে। কর্ম্মসূত্র, জোর করিয়া ছেঁড়া যায় না। কৃষ্ণ, তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। কিন্তু এখনও সময় হয় নাই। এখন যাও।

রূপ ও সনাতন, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। সেই দিন হইতে উভয়েরই মনে ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল। কিন্তু এ পরিবর্ত্তনের কথা কেহ জানিলনা। বাহিরে যেমন ছিলেন, দুই ভাই তেমনই রহিলেন।

ইহারই কতক দিন পরে রাত্রিতে বাদশাহের প্রাসাদে যাইবার সময়ে সনাতন মেথরের কথা শুনিলেন। অগ্নি ধূমায়িত ছিল, এবার ফুৎকার পড়িল।

৪

প্রভাতে দুই ভাই - রূপ ও সনাতন, বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন। সনাতন আজ বড়ই অন্যমনস্ক; রূপ কহিলেন, দাদা 'ক ভাবিতেছ?

"শ্ববৃত্তিতুল্যঃ খলু দাসবৃত্তিঃ"—রূপ, এ কথার অর্থ কি?

"কেন, দাদা, ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি এত বড় পণ্ডিত, বেদ বেদান্ত বুঝাইতে পার, আর এ কথাটা বুঝিতে পার না, ইহা কি সম্ভব?"

"রূপ, বুঝাইতে পারা আর নিজে বুঝা, দুই স্বতন্ত্র কথা। এতদিন বুঝাইয়াছি অনেক, কিন্তু নিজে বুঝি নাই কিছুই। এ কথাটাও না। বুঝিলে কি শ্ববৃত্তিতে জীবন কাটিতাম? একটা মেথর, কাল রাত্রিতে এ কথাটা আমাকে বুঝাইয়াছে।" সনাতন, গত রজনীর কথা রূপের নিকট বলিলেন।

দুই ভাই কিছুকাল নীরব হইয়া কি ভাবিলেন। তাহার পরে রূপ কহিলেন—"দাদা, যাহা বুঝিতাম না,

মেথরের কথায় তাহা বুঝিলাম। আজ হইতে আমার প্রবৃত্তির শেষ হইল।”

“আর বাদশাহের মন্ত্রীগিরি করিবে না?”

“না। আর চাই না। যথেষ্ট হইয়াছে। কুকুরের মত প্রভুর আদেশ পালন করিতে গিয়া মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছি, মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছি। কেবল আচারে পতিত হই নাই, দাদা; কেবলই যে পায়জামা চাপকান পরিয়া, শ্মশ্রু গুম্ফ রাখিয়া—ফার্সী জবান আবৃত্তি করিয়া বা দবীরখাস হইয়া পতিত হইয়াছি, তাহা নহে; অন্তরেও পতিত হইয়াছি। আর না, যথেষ্ট হইয়াছে। আমি আজই চাকলায় যাইব। সেখানে যাহা কিছু সঞ্চিত আছে, উহার একটা ব্যবস্থা করিয়া মহাপ্রভুর নিকট যাইব। শুনিয়াছি তিনি বৃন্দাবন যাইতেছেন। তুমি পাছে আইস। দুইজন একবারে যাইতে পারিব না।”

সনাতন বলিলেন—তুমি পলাইয়াছ, প্রকাশ হইলেই, বাদশা আমাকে বন্দী করিবেন। আমার আর যাওয়া ঘটিবেনা। তাহার পরে রূপ, বাদশার চাকরী না করি, এই ঐশ্বর্য্য, এসব ফেলিয়া যাইতে মনও যেন কেমন করে।

রূপ হাসিলেন। আমি তোমার মুক্তির উপায় করিয়া

যাইব। কিন্তু দাদা, বাসনাচ্ছেদ না হইলে যাইতে পারিবে না। আর যাইয়াই বা করিবে কি? যেখানে যাইবে বিষয়ও পাছে পাছেই আছে।

৫

রূপ, চাকলায় গেলেন। সেখানে যত অর্থ সংগৃহীত ছিল, তাহা লইয়া রামকেলি আসিলেন। সেই অগণিত অর্থের অর্দ্ধেক দান করিলেন, কতক আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণের জন্য রাখিলেন, অবশিষ্ট দশ হাজার আসরফি গৌড়ের এক বিশ্বস্ত মুদির নিকট পাঠাইয়া দিলেন যদি প্রয়োজন হয়, এই অর্থ দ্বারা সনাতন মন্ত্রিত্বের শৃঙ্খল ছেদন করিবেন।

তাহার পরে, রূপ, বল্লভকে বলিলেন, "ভাই, আমার ভোগ শেষ হইয়াছে; এই ঐশ্বর্য্য, এই পদমর্য্যাদা, বাদশাহের এত অনুগ্রহ, কিছুতেই আর মন বসে না; এসব রসহীন, ও পুরাতন বলিয়া বোধ হইতেছে; বুঝিয়াছি, এ সমুদয় লাভ করাই মানুষ জন্মের উদ্দেশ্য নহে, ইহা পাইলেই মানুষের সকল দুঃখ যায় না, সকল বাসনার নিবৃত্তি হয় না। যাহা পাইলে সকল আশা মিটে, তাহারই অনুসন্ধানে বাহির হইব। দেখি, যদি ভগবান কৃপা করেন। শুনিয়াছি, তিনি পতিতপাবন।"

"কোথায় যাইবে দাদা ?"

"প্রেমাবতার মহাপ্রভুর নিকটে।"

"আমিও যাইব।"

"তুমি কেন যাইবে ? তুমি গেলে শ্রীমান্ জীবকে কে পালন করিবে ? শ্রীমান্ যে আমাদের বংশের দীপ !"

"কেন ? গর্ভে যিনি রক্ষা করিয়াছেন, তিনি। তুমি আমি রক্ষা করিবার কে ? যাঁর জীব, তিনি না রাখিলে আমি এখানে থাকিলেই রাখিতে পারিব কি ?"

"সত্য। কিন্তু মায়া হইবেনা কি ? বার বার পিছনে ফিরিয়া চাহিলে সম্মুখে হাঁটিতে পারিবেনা।"

"যদি পিছনেই চাহিতে হয়, তবে আর এ ভোগ ছাড়িয়া যাই কেন ?

"তবে চল"।

সেইদিন রাত্রিতে দুই ভাই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কৌপিন কাঁথা মাত্র লইয়া প্রয়াগের পথে চলিলেন। রূপ সংবাদ পাইয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রয়াগে আছেন।

যাহার দোলার আগে পাছে বাজনা বাজিত, নকিব ফুকারিত, সওয়ার চলিত, সেই রূপ আজ দীনহীন ভিখারীর বেশে সকল ছাড়িয়া চলিলেন।

প্রয়াগে যাইয়া দুই ভাই চৈতন্যের শরণ লইলেন। তাঁহার কৃপায় উভয়ের অভীষ্ট লাভ হইল।

চৈতন্য রূপকে আদেশ করিলেন, বৃন্দাবনে যাইয়া লুপ্ততীর্থের উদ্ধার কর। নীলাচলে আবার আমার দেখা পাইবে।

রূপ, বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে একেক রাত্রি একেক বৃক্ষের তলে বাস করিয়া, অলবণ বনের শাক দুই চারি গ্রাস আহার করিয়া ভজন আর ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার করিতে লাগিলেন। রূপের সাধনে লুপ্ততীর্থের উদ্ধার হইল।

৬

বাদশা শুনিলেন রূপ সংসার ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। রূপের জন্য তাঁহার ব্যথাও হইল আবার ক্রোধও হইল। পাছে সনাতনও চলিয়া যান, এই ভয়ে তাহাকে নজরবন্দী করিলেন। সনাতন রাজকার্য্য করেন, পদমর্য্যাদা যেমন ছিল, তেমনই আছে, কিন্তু গৌড়ের বাহিরে যাইতে পারেন না।

সনাতনের বন্ধন ছুটিলনা, বরং আরও দৃঢ় হইল। তাঁহার ভোগ শেষ হয় নাই, তৃষ্ণা মিটে নাই। গৌড়ে

থাকিয়াই সনাতন রামকেলিতে নূতন প্রাসাদ গঠনের উদ্যোগী হইলেন।

তাঁহার গৃহের পার্শ্বে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত, ব্রাহ্মণের সে ভিটাটুকু না হইলে প্রাসাদ ভালরকম হয় না, সনাতন উহা কাড়িয়া লইলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, গৌড়ের মন্ত্রীর খেয়ালে বাধা দিতে পারিলনা। ভিটা ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৃন্দাবন অভিমুখে চলিল। শুনিয়াছিল, রূপ বৃন্দাবনে আছেন। ব্রাহ্মণের আশা, যদি রূপ দয়া করিয়া ভিটা খানা রক্ষা করেন।

ব্রাহ্মণ, বৃন্দাবনে গেল। যাইয়া দেখিল, রূপ আর সে রূপ নাই। সেই মহার্হ পরিচ্ছদমণ্ডিত রাজমন্ত্রী এখন কৌপিন কন্থাধারী, তাহার বাসস্থান বৃক্ষতলে, আহার বনের শাক। সে শাকও সকল দিন সংগ্রহ করেন না, সংগ্রহ করিতে অবসর হয় না। যে দিন শাক না যোটে, সেদিন রূপ সারাদিন পরে 'মাধুকরী' করেন—বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া যাহা পান, তাহাই আহার করেন। এ বৈরাগ্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন। রূপেরদিকে চাহিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল।

রূপ, এক বৃক্ষের তলে বসিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু লিখিতেছিলেন,এমন সময়ে ব্রাহ্মণ, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত

হইল। ব্রাহ্মণকে পাইয়া রূপের আনন্দের সীমা নাই, রামকেলির কথা, গৌড়ের কথা, দাদা সনাতনের কথা, কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ একে একে সকল কথার উত্তর দিয়া শেষে আপনার ভিটা খানার কথা বলিলেন। শুনিয়া রূপের মুখ গম্ভীর হইল। সনাতনের বাসনা ক্ষয় না হইয়া বাড়িতেছে জানিয়া রূপ দুঃখিত হইলেন।

রূপ বলিলেন ঠাকুর, সংসার ত্যাগ করিয়াছি, আর গ্রাম্য কথায় থাকিবনা বলিয়া এই বৃন্দারণ্যে আসিয়াছি। তোমার জন্য কি করিতে পারি- ভাবিয়া পাইতেছিনা। একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি, গৌড়ে যাইয়া এই পত্র দাদাকে দিও। সম্ভব, তোমার ভিটা তিনি ফিরাইয়া দিবেন।

সম্মুখে একখানা খাপরা পড়িয়াছিল, রূপ উহাতে লিখিলেন :—

য———— রী

র———— লা

ই———— রুং

ন———— য়।

ব্রাহ্মণ, এ পত্রীর অর্থ কিছুই বুঝিলনা। খাপরা লইয়া গৌড়ে আসিল।

মধ্যাহ্নে আহার করিয়া সনাতন নিদ্রাগত হইয়াছেন এমন সময়ে ব্রাহ্মণ, তাঁহার প্রাসাদে উপস্থিত হইল। দ্বারী বলিল, ঠাকুর, উজীর সাহেব, নিদ্রায় আছেন, না উঠিলে দেখা পাইবে না। ব্রাহ্মণ বসিয়া রহিল।

অন্য দিন যে সময়ে সনাতন নিদ্রা হইতে উঠেন, আজ সে সময় গত হইল, উঠিলেন না। প্রতিহারী দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—জাহাপনা, বেলা গেল, এখন উঠুন।

সনাতন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—এক গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী, তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিতেছে :—

"দিন যামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ
শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ।"

ঠিক সেই সময়েই এক শাক বিক্রেতা হাঁকিল—"গুয়া-পানং চুকা"। এধ্বনি শুনিয়া সনাতন জাগরিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—সন্ন্যাসী বলিলেন কালের ক্রীড়ায় আয়ু যাইতেছে কিন্তু আশা বায়ু আমাকে ছাড়িতেছেনা। সত্যই ত। আমি আশার নেশায় বিভোর হইয়া রহিয়াছি। রূপ গেল, বল্লভ গেল, আমি রহিলাম কেন? যৌবন

গেল, বার্দ্ধক্য আসিল, বাসনা ছাড়েনা কেন ? ও আবার কে বলিল—"শুয়া পালং চুকা" পালঙ্কে শুইয়া চুক করিয়াছি। ঠিক্ ঠিক্। যাহাকে মাটীতে মিশিতে হইবে, সে আবার পালঙ্কে কেন ?

সনাতন ভাবিতেছেন, এই সময়েই দ্বারী বলিল— বেলা নাই। এতক্ষণ বহ্নি, ধূমায়মান ছিল, দ্বারীর কথায় জ্বলিয়া উঠিল। সনাতন আপনার পক্ক শ্মশ্রুরদিকে চাহিয়া বলিলেন, সত্যইত বেলা নাই। আর না, ভোগের অবসান হউক প্রভু।

সনাতন শয্যা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার হাতে খাপরা দিল। সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর এ কি ?"

"উজীর দবীর খাস আপনাকে এই পত্র লিখিয়াছেন।"

"রূপ ?"

"তিনিই"

"তুমি, তাঁহাকে কোথায় পাইলে ?"

"বৃন্দাবনে।"

"রূপ, বৃন্দাবনে কি ভাবে আছেন ?"

"অতি দীন, কান্থা কৌপিন ভিন্ন অন্য সম্বল নাই। বৃক্ষতলে বাস, কখনও মাধুকরী করিয়া কখনও বা

উপবাসে দিন কাটেন। মুখে কেবল কৃষ্ণ নাম। বদন বড় উজ্জ্বল, বড় প্রফুল্ল, বাক্য অমৃতের মত।"

সনাতন, দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—রূপ, তুমি ভাগ্যবান্। তুমি যে ধনের সংবাদ পাইয়াছ, উহা পাইলে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ মনে হয়। তাহার পরে খাপরা লইয়া পড়িতে লাগিলেন—য—রী, র—লা একি সঙ্কেত? পণ্ডিত সনাতন অনেকক্ষণ ভাবিয়া পত্রীর পাঠ উদ্ধার করিলেন:—

"যদুপতে ক্ব গতা মথুরা পুরী?
রঘুপতে ক্ব গতোত্তর কোশলা?
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

আপন মনে সনাতন বলিতে লাগিলেন—রূপ সত্যই আমি অসৎ জগৎকে সৎ বলিয়া আকৃষ্ট হইতেছিলাম। কিন্তু আর না।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রাহ্মণ, তুমি কেন রূপের নিকটে গিয়াছিলে?,,

এ কথার উত্তর দিতে যাইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের হৃদকম্প হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিল না,

নীরব হইয়া রহিল। তাহার সেই ভাব দেখিয়া সনাতন বলিলেন,—ভয় নাই, কেন গিয়াছিলে বল।

সাহস পাইয়া ব্রাহ্মণ বলিল—জাঁহাপনা, আমার ভিটা খানা চাহিবার জন্য গিয়াছিলাম।

"যে ভিটায় আমি প্রাসাদ গড়িতেছি, সেই ভিটা ?" সনাতনের এ প্রশ্ন শুনিয়া ব্রাহ্মণের আর কিছু বলিবার শক্তি রহিল না। ভয়ে কণ্ঠ শুকাইয়া গেল।

সনাতন বলিলেন, বুঝিয়াছি। তুমি তাহার জন্যই গিয়াছিলে। ভালই করিয়াছ। প্রাসাদ যেমন হইতেছে, হউক। ঐ প্রাসাদ এবং রামকেলিতে আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, সব তোমাকে দিলাম।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইল। ভয়ে ও বিস্ময়ে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—সব আমাকে ! হুজুর, এ কি বলিতেছেন ? আমি বড় গরীব।

ঠিকই বলিয়াছি। আজ হইতে রামকেলিতে আমার যাহা কিছু আছে, সব তোমার। অপেক্ষা কর, দান পত্র লিখিয়া দেই।

সনাতন দান পত্র লিখিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বিদায় হইল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল,—বৈরাগীর আটটা অক্ষরের কি শক্তি ! আমাকে একবারে রাজা

করিয়া দিল। কিন্তু এ রাজৈশ্বর্য্য পাইয়া সুখ হইবে কি? ইহাতে যদি সুখ হইত, তবে ইহারা ছাড়ে কেন?

৭

সনাতনের আর রাজকার্য্যে মন নাই। বাদশাহ, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেন। রাজসভায় অনেকক্ষণ থাকেন না। নিয়ম রক্ষার জন্য একবার দরবারে যান, কিছুকাল পরেই গৃহে ফিরিয়া আসেন। দিবারাত্রি কেবল ভাগবত পড়েন আর নাম করেন।

শেষে সেই কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য রাজসভায় যাওয়াও আর ভাল লাগেনা। সনাতন, বাদশাহকে বলিয়া পাঠাইলেন আমার দেহ অসুস্থ। দরবারে যাতায়াত বন্ধ হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া সনাতন দিবারাত্রি গীতা ও ভাগবত আলোচনা করিতে লাগিলেন।

সনাতনের পীড়ার কথা শুনিয়া বাদশাহ রাজবৈদ্য পাঠাইয়া দিলেন।

বৈদ্য আসিল, নাড়ী ধরিল, কোন রোগ না দেখিয়া হাসিয়া উজীরকে বলিল—"বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব?"

"বলিও, বায়ুর পীড়া।"

বৈদ্য, বাদশাহের নিকট আসিল। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, উজীরের কি পীড়া? বৈদ্য বলিল—জাহাপনা শরীরের পীড়া তেমন কিছু নয়, সামান্য বায়ুর প্রকোপ। কিন্তু মনে ব্যাধি হইয়াছে। সে ব্যাধির চিকিৎসা, আমাদের শাস্ত্রে নাই।

বাদশাহ,—হাঁ, পীড়ার কথা আমিও কতক বুঝিয়াছি। একবার নিজে যাইয়া দেখিব।

সেইদিন অপরাহ্নে বাদশাহ, সনাতনের আবাসে গেলেন। যাইয়া দেখেন, সনাতন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। শরীরে ব্যাধির চিহ্ন মাত্রও নাই। বাদশাহের ক্রোধ হইল। ক্রোধে ও অভিমানে বলিলেন—মল্লিক, তোমার ভাই দস্যুর মত, আমার চাকলা লুঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল খোঁজ নাই। তুমিও রাজকার্য্য ছাড়িয়া গৃহে বসিয়া ব্যাধির ভাণ করিতেছ। মনে হয়, তুমিও পলাইবার চেষ্টায় আছ। কিন্তু আমি তোমাকে সে সুবিধা দিব না। আজি হইতে এই প্রাসাদেই তুমি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলে।

বাদশাহের আদেশে উজীর সনাতন, তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন। আর শাস্ত্রালোচনার সুযোগ রহিলনা,

পলায়নের পথও রুদ্ধ হইল। কাজেই সনাতন ফাঁফরে পড়িলেন।

উড়িয়ারা বাঙ্গালার দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিতেছে সংবাদ পাইয়া বাদসাহ স্বয়ং দক্ষিণ দেশে গেলেন।

সনাতন দেখিলেন, পলায়নের এই সুযোগ। রূপের দশ হাজার আসরফি মুদীর ঘরে ছিল, উহাই দিয়া সনাতন, আপনার বন্ধন মোচন করিতে উদ্যোগী হইলেন।

সনাতনের প্রহরীদিগের অধ্যক্ষ একজন মুসলমান। সে প্রথমে সামান্য ভৃত্য ছিল, সনাতনের অনুগ্রহেই জমাদার হইয়াছে। সনাতন তাহাকে ডাকিলেন। জমাদার আসিয়া সেলাম করিল।

সনাতন বলিলেন—মীর. মনে পড়ে আমিই তোমাকে এই উচ্চ পদ দিয়াছি।

জমাদার পুনরায় সেলাম করিয়া বলিল—"হুজুর, এ বান্দার কিছুই ভুল হয় নাই।"

"আমি তোমার উপকার করিয়াছি। আজ আমায় কিছু প্রত্যুপকার কর।"

"আদেশ করুন, হুজুর ; সাধ্য থাকিলে বান্দা, অবশ্যই হুকুম পালন করিবে।"

"শোন মীর, বাদশা আমাকে কয়েদ করিয়াছেন

সত্য কিন্তু যদি বলি আমি উজীরী করিব, তাহাহইলে এখনই আমাকে মুক্তি দিয়া বখশিস দেন।”

“সে কথা সত্য হুজুর। আপনাকে ছাড়া গৌড়ের বাদশাহী চলিবার উপায় নাই। হুজুরের উপরে বাদশাহের বড় পেয়ার।”

“কিন্তু আমি আর উজীরী করিবনা। আমি পলাইতে চাই। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও। এই উপকার কর। তোমাকে তিন হাজার আসরফি বখশিস দিব।”

“হুজুর, বাদশাহ জানিলে আমার গর্দ্দান থাকিবেনা, হুজুরের বখশিস কে ভোগ করিবে? আমার ক্সান বাচ্চার জীবন্ত কবর হইবে।”

“বাদশাহ জানিতে পারিবেন না। তুমি বলিও বেড়ি লইয়া কয়েদী নদীর ধারে বহিঃকৃত্য করিতে গিয়াছিল; হঠাৎ বেড়িসহ নদীতে ঝাঁপদিয়া পড়িয়া ডুবিয়া মরিয়াছে; মরিবার উপর দাবি নাই। বাদশাহ তোমাকে কিছু বলিবেনা। তোমায় পাঁচ হাজার আসরফি দিব।”

“না হুজুর আমার সাহস হয় না; আমার গর্দ্দান যাইবে। আপনি মনীব, উপকারী। যদি পারিতাম, আপনার কাজ করিতে এ বান্দা অসম্মত হইত না।”

শোন মীর, আমি দরবেশ হইয়া মক্কা যাইব, এদেশে

রহিবনা। কেহ আমার খোঁজ পাইবেনা। তুমি ভয় করিও না। তোমাকে সাত হাজার আসরফি এখনই দিতেছি। দুইচারি জনমে এত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবেনা। সম্মত হও। আমি পরমেশ্বরের নাম করিতে বাহির হইব. আমাকে ছাড়িয়া দিলে তোমার পুণ্য হইবে।

পুণ্যলোভে না হউক, সাত হাজার আসরফির লোভে জমাদার সম্মত হইল।

সনাতন, মুদীর দোকান হইতে মোহর আনাইয়া জমাদারকে দিলেন। জমাদার বেড়ি খুলিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিল।

বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশানকে লইয়া সনাতন দরবেশ বেশে গৌড় ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

৯

গৌড় দেশ হইতে পশ্চিমমুখে বাহির হইবার পথ—গড়িদ্বার বা তেলিয়া গড়ি। গড়িদ্বারে, বাদশাহের প্রহরী থাকে। সনাতন সে পথে গেলেন না। তিনি রাজমন্ত্রী হইলেও এখন রাজবন্দী। আবার কয়েদ হওয়া অসম্ভব নহে।

ঈশানকে সঙ্গে লইয়া সনাতন পাতড়া পর্ব্বতের পথে

চলিলেন। সে পথে বড় কেহ যাতায়াত করে না। পথ দুর্গম, দস্যু পূর্ণ।

দুইদিন অবিশ্রামে চলিয়া সনাতন অরণ্যমাঝে প্রবেশ করিলেন। এ দুইদিন কেবল উপবাস, কিছুই আহার মিলিল না, আহার করিতে অবসরও হইল না।

চারিদিকে বিশাল অরণ্য, সম্মুখে গগনস্পর্শী দুরারোহ পর্ব্বতমালা। সে অরণ্যে পথ নাই। মানুষ কখনও যাতায়াত করে এমন চিহ্ন মাত্রও নাই। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সনাতন বুঝিলেন পর্ব্বতবাসীর সহায়তা না পাইলে এ বনভূমি হইতে বাহির হইতে পারিবেন না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঞারা সেই অরণ্যের অধিপতি। রাজ্য ক্ষুদ্র, রাজাও ক্ষুদ্র; কিন্তু কি রাজা কি প্রজা সকলেই দস্যু। বিপন্ন পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও প্রাণবধ, তাহাদের ব্যবসায়।

সনাতন, এক ভূঞার বাড়ী যাইয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিবার জন্য তাহাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। ভূঞার সঙ্গে এক গণক ছিল, সে গণিয়া ভূঞার কাণে কাণে বলিল, এই দরবেশের সঙ্গে আটটি মোহর আছে। ভূঞা অর্থলোভে সনাতনকে আদর করিয়া বলিল, তুমি উপবাস করিয়া রহিয়াছ, আমার এখানে রন্ধন ভোজন কর,

রাত্রিতে আমার পাইক সঙ্গে দিয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিব। এই বলিয়া ভূঞা রন্ধনের আয়োজন আনিয়া দিল, আদর আপ্যায়ন করিতে লাগিল।

সনাতন—রাজমন্ত্রী ; এত আদর যত্ন দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট অর্থ আছে ?"

"আছে প্রভু। সাত খানি মোহর মুদীর দোকান হইতে লইয়া আসিয়াছি, কি জানি পথে প্রয়োজন পড়িতে পারে।"

"ভাল কর নাই, ঈশান। এখন এই অর্থের জন্য প্রাণ যাইতে বসিয়াছে। শীঘ্র উহা বাহির করিয়া দাও।"

ঈশানের নিকট হইতে মোহর লইয়া সনাতন, ভূঞার নিকট যাইয়া বলিলেন আমার—এই সাতখানি মোহর আছে, ইহা লইয়া আমাকে পর্ব্বত পার করিয়া দাও। আমি রাজবন্দী, আমাকে পার করিয়া দিলে তোমার পুণ্য হইবে।

ভূঞা হাসিয়া কহিল, তোমার ভৃত্যের নিকট আট মোহর আছে, পূর্ব্বেই জানিয়াছি। আজ এই মোহরের জন্য তোমাদের প্রাণ যাইত। আমরা তোমাদিগকে মারিয়া মোহর লইতাম। তুমি ইহা বাহির করিয়া দিয়া

ভাল করিলে। আমি বড় তুষ্ট হইলাম, বুঝিলাম, তুমি সত্য সত্যই দরবেশ। তোমার এ মোহর আমি লইব না। তুমি ভোজন কর, পুণ্যের জন্যই তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে পর্ব্বত পার করিয়া দিব।

সনাতন বলিলেন ভূঞা, তুমি না নিলে অন্য কেহ ইহার লোভে আমাদিগকে বধ করিতে পারে। তুমি ইহা লও। এই বলিয়া সনাতন, ভূঞাকে মোহরগুলি দিলেন। ভূঞাও বুঝিল কথা ঠিক, দরবেশের জীবন রক্ষার জন্যই সে মোহর লইল।

সনাতনের রন্ধন ভোজন হইলে ভূঞা চারিজন পাইক সঙ্গে দিয়া রাত্রিতেই পর্ব্বত পার করিয়া দিল।

পর্ব্বত পার হইয়া যাইয়া সনাতন, ঈশানকে কহিলেন, "ঈশান, তোমার নিকট এখনও অর্থের অবশেষ আছে।"

ঈশান কহিল "প্রভু, এক মোহর আপনার নিকট গোপন করিয়াছিলাম, উহা সঙ্গে আছে।"

"উহা রাখিয়া ভাল কর নাই। বুঝিলাম ঈশান, তোমার অর্থলোভের নিবৃত্তি হয় নাই। এই মোহর লইয়া তুমি দেশে ফিরিয়া যাও। আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া সনাতন, পশ্চিম মুখে চলিলেন। আর পাছে ফিরিয়া চাহিলেন না।

যতক্ষণ দেখা গেল, ঈশান সেই দরবেশমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গৌড়ের দিকে যাত্রা করিল।

১০

হাতে ‘করোয়া’, স্কন্ধে জীর্ণকন্থা, পরিধানে জীর্ণ মলিন বাস, দরবেশ, হাজিপুরে আসিলেন। হাজিপুরের প্রান্তে এক আম্রকানন, সন্ধ্যাকালে সনাতন সেই আম্রকাননে আশ্রয় লইলেন। এখনও গৌড়ের সীমা ছাড়িতে পারেন নাই, কাজেই প্রচ্ছন্ন থাকিতে হয়।

কিন্তু একজন, এই বেশেও তাঁহাকে চিনিল। সনাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্ত, হাজিপুরে থাকিয়া গৌড়ের বাদশাহের কার্য্য করেন। তিনি টুঙ্গীর উপর বসিয়া দরবেশকে দেখিলেন, দেখিয়া চিনিলেন। শ্রীকান্ত বুঝিলেন, সনাতন বন্দীশালা হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন। কাজেই দিবাভাগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; হাজিপুরে বাদশাহের রাজপুরুষেরা ছিল, পাছে তাহারা জানিয়া কোন অনিষ্ট করে।

রাত্রিতে শ্রীকান্ত সনাতনের নিকটে আসিলেন। সেই আম্রকাননে বসিয়া দুইজনে আলাপ করিলেন।

রূপের পলায়ন হইতে নিজের বন্ধন ও মুক্তির সকল কথা সনাতন, শ্রীকান্তকে বলিলেন।

শ্রীকান্ত কহিলেন, যদি একান্তই সংসার ত্যাগ করিতে মনন করিয়া থাক, তাহাহইলেও দুই চারিদিন এখানে থাক। এই জীর্ণকন্থা ও মলিন বস্ত্র ছাড়িয়া ধৌত বস্ত্র পর। তোমার এবেশ দেখিতে বুক ফাটিয়া যায়।

সনাতন বলিলেন—শ্রীকান্ত আর ভোগের ইচ্ছা নাই, এই দীনবেশই আমার উপযুক্ত। তুমি দুঃখিত হইওনা। আমাকে গঙ্গা পার করিয়া দাও, আমি এখনই চলিয়া যাইব। আমি রাজবন্দী, গৌড় রাজ্যে আমার অবস্থান, সঙ্গত নহে।

শ্রীকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, যদি নিতান্তই যাইতে চাও, যাও; জানি তোমাকে রাখিতে পারিবনা। গৌড়ের সেই উজীরী, রামকেলির সেই ঐশ্বর্য্য যে ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছে তাহাকে কোন আকর্ষণে বাঁধিব? যাও, কিন্তু এই জীর্ণকন্থা ছাড়িয়া এই ভোটকম্বল খানা লইয়া যাও। এই বলিয়া শ্রীকান্ত কাঁথা টানিয়া ফেলিয়া সনাতনের গাত্রে ভোটকম্বল জড়াইয়া দিলেন।

সনাতন বলিলেন—ভাই, যদি ইহাতেই তুমি সন্তুষ্ট

হও, তবে দাও, আমি ভোট লইলাম। আমায় এখন পার করিয়া দাও।

শ্রীকান্ত গঙ্গা পার করিয়া দিলেন, সনাতন বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে শুনিয়াছিলেন, মহাপ্রভু বারাণসী গিয়াছেন।

১১

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, বারাণসী যাইয়া চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বারাণসীতে, চৈতন্যের কিছু প্রয়োজন ছিল। সেখানকার দণ্ডীরা ভক্তি বুঝিতনা; ভক্তিকে বলিত "ভাবকালি", তাঁহারা জ্ঞানের পথে ব্রহ্মকে পাইতে চাহিতেন, ভক্তির ভগবানকে চিনিতেন না। মুখে বলিতেন, "রসো বৈ সঃ" কিন্তু রসের কথা তাঁহাদের ভাল লাগিত না। তাঁহারা 'সোঽহং' চিন্তা করিয়া আপনি ব্রহ্ম হইতেন, কিন্তু ব্রহ্মাস্বাদের আনন্দ পাইতেন না। এই দণ্ডীদিগকে ভক্তি বুঝাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

সনাতন, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের দ্বারদেশে যাইয়া বসিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস নাই; মনে ভয়, আমি বিষয়সেবী, নীচ জাতি, নীচকর্ম্মী, আমাকে কি প্রভু দর্শন দিবেন?

সনাতন যখন বাহিরে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় গৃহের মধ্যে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে বলিলেন আচার্য্য, বাহিরে একটি বৈষ্ণব বসিয়া আছে, উহাকে ভিতরে লইয়া আইস।

চন্দ্রশেখর দ্বারের নিকটে গেলেন, দেখিলেন বাহিরে এক কেশশ্মশ্রুধারী দরবেশ বসিয়া আছে, বৈষ্ণব নাই। বৈষ্ণবেরা মুণ্ডিতশীর্ষ হইত।

চন্দ্রশেখর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "প্রভু, দ্বারে বৈষ্ণব নাই।"

"একজন কেহ অবশ্যই আছে।"

"আছে। একটি দরবেশ বসিয়া আছে।"

মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন—"ঐ দরবেশকেই লইয়া আইস।"

চন্দ্রশেখর আবার দ্বারের নিকট যাইয়া দরবেশকে বলিলেন—প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন।

সনাতন আনন্দে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এখনও ভয়, আমার মত অপবিত্রকে কি প্রভু দর্শন দিবেন? সনাতন ভয়ে ভয়ে পা ফেলিতেছেন, প্রতিপদক্ষেপেই তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই ভাবে যেই সনাতন অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি মহাপ্রভু

দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এ স্পর্শে সনাতনের নেত্র হইতে দরদর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল, শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, যেন কোন দৈব বিদ্যুৎ তাঁহার শরীরে ও মনে প্রবাহিত হইয়া গেল। প্রভুও সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন, তাঁহারও অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

কিছুকাল এইভাবে গেল। তাহার পরে মহাপ্রভু সনাতনের হাত ধরিয়া টানিয়া পিঁড়ার উপর লইয়া গেলেন ; সেখানে নিয়া আপনার পাশে বসাইয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সনাতন বড় অপরাধীর মত সঙ্কোচে বলিতে লাগিলেন, এ কি করেন, আমি মহাপাপী, আমাকে স্পর্শ করিবেন না।

প্রভু বলিলেন—সনাতন, আমি নিজে পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতেছি। তুমি ভক্তিবলে এ ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিতে পার। শোন, ভগবান্ দয়াময়, তিনি দয়া করিয়া তোমাকে ভোগের নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। কিরূপে বাদশাহের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইলে বল।

সনাতন আপনার বন্ধন ও মুক্তির সমুদয় বিবরণ মহাপ্রভুকে বলিলেন।

মহাপ্রভু বলিলেন, রূপ ও অনুপম প্রয়াগে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহারা দুই ভাই বৃন্দাবনে গিয়াছে। তোমাকেও সেখানে যাইতে হইবে। এখন যাও, ক্ষৌর করাইয়া এ বেশ পরিত্যাগ কর। চন্দ্রশেখর, সনাতনকে লইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন। সেখানে কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া সনাতন গঙ্গাজলে স্নান করিলেন; পবিত্র হইলেন।

চন্দ্রশেখর, তাঁহাকে একখান নূতনবস্ত্র পরিতে দিলেন। সনাতন উহা পরিলেন না, বলিলেন, আচার্য্য আমি দৈন্যব্রতী, এ নূতন বস্ত্র আমার সাজে না। আপনার একখানি পুরাতন বসন, আমাকে দিন, আমি উহাই পরিব। চন্দ্রশেখর, পুরাতন বস্ত্র দিলেন।

মহাপ্রভু শুনিলেন, সনাতন নূতনবস্ত্র পরেন নাই, শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। বুঝিলেন, ভোগ বাসনার আগুন, সনাতনের হৃদয় হইতে একবারে নিভিয়া গিয়াছে। সনাতনকে লইয়া মহাপ্রভু তপন মিশ্রের গৃহে 'ভিক্ষা' করিতে গেলেন। সে দিন সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল।

মহাপ্রভুর সেবা হইলে তপন মিশ্র তাঁহার প্রসাদ সনাতনকে দিলেন। সেই প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া সনাতনের প্রাণে যেন আনন্দের উৎস খুলিয়া গেল।

মিশ্র, সনাতনকে একখানি নূতন কাপড় দিলেন, সনাতন উহা লইলেন না। বলিলেন, ঠাকুর আমি বৈরাগী, যদি আমাকে দিতে হয়, একখানি পুরাতন বস্ত্র প্রদান করুন। মিশ্র, অগত্যা একখানি পুরাতন বস্ত্র দিলেন। সনাতন উহা ছিঁড়িয়া একখানি কৌপিন ও একখানি 'বহির্ব্বাস' করিলেন।

এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, মহাপ্রভুর ভক্ত। মহাপ্রভু তাঁহার সহিত সনাতনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, সনাতন যতদিন বারাণসী থাকেন, আমার গৃহে 'ভিক্ষা' করিবেন। সনাতন উহা শুনিয়া বলিলেন, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতিদিন ভিক্ষা গ্রহণ করিলে আমার অপরাধ হইবে। আমি 'মাধুকরী' করিব।

সনাতনের দৈন্য ও বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভু বড়ই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের একটু অবশেষ তখনও সনাতনের সঙ্গে ছিল,—একখানি ভোট কম্বল, তাহার গাত্রে ছিল। মহাপ্রভু বারবার সেই ভোট কম্বলের দিকে চাহিতে লাগিলেন। মুখে কিছু বলিলেন না।

সনাতন, মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন। বুঝিলেন, ঐশ্বর্য্যের এই অবশেষ আর তাহাকে সাজিতেছে না।

সেই দিন মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া সনাতন দেখি-লেন এক গৌড়িয়া বৈরাগী, একখানি জীর্ণকাঁথা ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইতেছে। সনাতন বলিলেন ভাই, আমার একটা উপকার কর। আমার এই ভোট কম্বল লইয়া তোমার কাঁথা খানা আমায় দাও।

গৌড়িয়া বিস্মিত হইল, মনে ভাবিল এ বৈষ্ণব আমাকে পরিহাস করিতেছে। বিরস মুখে কহিল, বাবাজী, ভোট দিয়া কাঁথা লইবে এ কি কথা?

সনাতন কহিলেন, ভাই পরিহাস করিতেছিনা, সত্য সত্যই ভোটের বদলে কাঁথা চাহিতেছি। আমার কাঁথারই প্রয়োজন। তুমি, ভোট লও। এই বলিয়া গৌড়িয়াকে ভোট কম্বল দিয়া সনাতন, জীর্ণ কাঁথা লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

মহাপ্রভু, সনাতনের স্কন্ধে কাঁথা দেখিয়া প্রফুল্লমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, সনাতন, তোমার ভোট কোথায়? সনাতন বলিলেন, প্রভু, এক গৌড়িয়াকে ভোট দিয়া তাহার কাঁথা লইয়া আসিয়াছি।

প্রভু বলিলেন—সনাতন, ভাল করিয়াছ। ভগবান, তোমার উপর বড় সদয়, তিনি তোমার বিষয়-রোগ দূর করিয়াছেন। সদ্‌বৈদ্য, রোগ দূর করিয়া কখনও

অবশেষ কিছু রাখেনা। তাই ভগবান, তোমার বিষয়ের অবশেষটুকুও আজ দূর করিলেন। সনাতন, যাহার গায়ে তিন মুদ্রার ভোট কম্বল, সে 'মাধুকরী' করিতে গেলে শোভা পায় না। ভোট ত্যাগ করিয়া ভাল করিয়াছ।

১১

সনাতনের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, আর উহাতে ভোগ বাসনার মলিনতা নাই। সেই নির্ম্মলচিত্তে তত্ত্বজিজ্ঞাসা আপনি স্ফুরিত হইয়াছে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু আমি কে? আমাকে কেন ত্রিতাপে জীর্ণ করে? কিরূপে আমার হিত হইবে, আমার সাধনার বিষয় কি, কিছুই জানিনা। কিরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহাও জানিনা। প্রভু, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছ, কৃপা করিয়াই আমার কর্ত্তব্য কি বল। আমি নীচ জাতি, নীচসঙ্গী, চিরদিন বিষয়কূপে পড়িয়া জন্ম কাটাইলাম। নিজের হিতাহিত কিছুই চিন্তা করি নাই। শাস্ত্র পড়িয়াছি, লোকেও পণ্ডিত বলে, কিন্তু প্রভু আপনার হিতাহিত বুঝিবার জ্ঞানটুকুও এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই। তুমি কৃপা

করিয়া বল, আমাকে কি করিতে হইবে, কি করিলে আমার তাপত্রয়ের জ্বালা নিভিয়া যাইবে।

প্রভু কহিলেন, সনাতন, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, বৃহস্পতির মত বুদ্ধিমান্, তাহার উপর ভগবান তোমাকে কৃপা করিয়াছেন। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সে সমুদয়ই তুমি জান। তথাপি চিত্তে দৃঢ়তা লাভের জন্যই আমাকে প্রশ্ন করিতেছ। মহাজনেরা এইরূপেই চিত্তে বল লাভ করেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রে অনেকবার পড়িয়াছ, কিন্তু আপন মনে প্রশ্ন না জাগিলে শাস্ত্র পাঠে কিছু হয় না। এতদিন তোমার আপন মনে এ সকল প্রশ্ন জাগরিত হয় নাই। চিত্ত তখন বিষয়-বাসনায় ভোগের মলিনতায় মলিন ছিল। আজ চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাই এ সকল প্রশ্ন আপনি জাগিয়া উঠিয়াছে।

এই বলিয়া মহাপ্রভু, কিরূপে ত্রিতাপের জ্বালা দূর হইতে পারে সনাতনকে তাহার উপদেশ দিলেন। সনাতন, এতদিন শাস্ত্র পড়িয়া বুঝেন নাই, আমি কে? আমার কর্ত্তব্য কি? জীব কি, ঈশ্বর কি?—আজ বুঝিলেন। বুঝিয়া অপার আনন্দে প্রাণ ভরিয়া গেল।

মহাপ্রভু বলিলেন—সনাতন, ভগবান মধুময় ঃ—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং।

ইঁহার দেহ মধুর, বদন মধুর, হাস্য মধুর ; ইঁহার সমস্তই মধুর মধুর মধুর। ইঁহাকে পাইলেই জীব আপনি মধুময় হয়, আর দুঃখ তাপ থাকেনা, সকল জ্বালা নিভিয়া যায়, জীবন সার্থক হয়।

বলিতে বলিতে মহাপ্রভু আনন্দে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। ক্ষণ পরে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, সনাতন, আমি বাউল, কি বলিতে কি বলিয়া কেমন হইয়া যাই, স্থির থাকিতে পারি না। তাঁহাকে পাইতে হইলে তুমি তন্মনা, তদ্‌যাজী, তদ্‌ভক্ত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার কর।

সনাতন একান্ত মনে নমস্কার করিলেন।

মহাপ্রভু, তখন বলিলেন, সনাতন, তত্ত্বকথা কেবল আপনি জানিলেই হইবেনা, জগৎকে শিখাইতে হইবে। ভগবান্‌কে পাইয়া কেবল আপনি কৃতার্থ হইলেই হইবেনা, সকলে যাহাতে তাঁহাকে পায় তাহা করিতে হইবে।

ভক্তিই তাঁহাকে লাভের একমাত্র উপায়। তুমি বৃন্দাবনে যাইয়া ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার কর। উহাতে জীবের মঙ্গল হইবে।

সনাতন, বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে অনিকেতন হইয়া—বৃক্ষতলে রহিয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার করিতে লাগিলেন।

সুখদুঃখ, লাভ-ক্ষতি, শীত উষ্ণ, নিন্দা ও স্তুতি তাঁহার নিকট সমান হইয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ে হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ, শোক, আকাঙ্ক্ষা—কিছুই রহিলনা। সনাতন, গোস্বামী হইলেন,—মুক্ত হইলেন। তাঁহার সকল জ্বালা নিভিয়া গেল।

অদৃষ্ট।

১

মনোহর সৌধমালায় ভূষিত, অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী, শিপ্রা নদীর তীরে এক খণ্ড স্বর্গের মত বিরাজিত ছিল। উজ্জয়িনীর সরোবরে নিত্য পদ্ম ফুটিত, উপবনে নিত্য কোকিল গান করিত, গৃহে গৃহে নিত্য মহোৎসব হইত। শিপ্রার শীতল বাতাস উজ্জয়িনীর সকল শ্রান্তি দূর করিয়া দিত। সে কালে যে উজ্জয়িনী না দেখিত, তাহার চক্ষু, সার্থক বলিয়া গণ্য হইত না। কিন্তু এই ভূ-স্বর্গ যিনি গড়িয়াছিলেন সেই বিক্রমাদিত্য সম্রাট হইয়াও ছিলেন সন্ন্যাসী।

বাহিরে বিরাট আড়ম্বর, দরবার গৃহে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য : কিন্তু সম্রাটের শয়ন কক্ষে ছিল, একখানি ছিন্ন মাদুর, একটি মৃৎ-কলসী, এবং একখানি গৈরিক বস্ত্র। তাঁহার আহার্য্য ছিল ফল মূল।

বিক্রমাদিত্য, সমগ্র ভারতের জ্ঞান ও শক্তি, বিলাস ও বৈরাগ্য, শৌর্য্য ও সৌন্দর্য্য, কলা ও কৌশল উজ্জয়িনীতে একস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার সভা,— নবরত্ন ; ধন্বন্তরী, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট,

ঘটকর্প্পর, কালিদাস, বরাহাচার্য্য ও বররুচি,—সেই নবরত্নের রত্নরাজি। চিকিৎসা, জ্যোতিষ, দর্শন ও কাব্য আলোচনায় রাজসভা বাণীর নিত্য বিলাস-ক্ষেত্র ছিল।

একদিন সভায় কথা হইল, কবি ও জ্যোতিষী, ইহার মধ্যে কে ভবিষ্যদ্‌বক্তা, কাহার কথা ঠিক?

কালিদাস, বলিলেন, কবি ভারতীর কৃপায় দৈবদৃষ্টি লাভ করিয়া অতীত ও অনাগত বলিয়া থাকেন। তাঁহার বাক্য সত্য। তাঁহার মানসী সৃষ্টির তিনিই প্রজাপতি, তিনিই বিধাতা। তিনি যাহা কল্পনা করেন, সমাজ, তাহাই হইয়া উঠে। অন্যরূপ হইতে পারে না।

বরাহাচার্য্য জ্যোতির্ব্বিদ: তিনি বলিলেন, মহারাজ, কবির কথা কল্পনা মাত্র; উহা সত্য হইতে পারে না। কবি, ভবিষ্যদ্বক্তা নহেন। জ্যোতির্ব্বিদ্‌ই একমাত্র মানুষের ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন। শাস্ত্রে আছে:—

"বিধাত্রা লিখিতা যা তু ললাটেঽক্ষর মালিকা।
জ্যোতির্ব্বিত্তাং বিজানীয়াৎ হোরা-নির্ম্মল চক্ষুষা।"

বিধিলিপি, কেবল জ্যোতিষীই পড়িতে পারেন। কবি, কিরূপে সে কথা বলিবেন? তিনি তাঁহার মানসী সৃষ্টির বিধাতা হইতে পারেন, কিন্তু বিধাতার সৃষ্টির তিনি কে? সে সৃষ্টির ভাবি-রহস্য-পেটিকার কুঞ্চিকা

জ্যোতিষীর হাতে। হোরা-নির্ম্মল চক্ষু দিয়া জ্যোতিষী মানবের ললাট-লিপি পাঠ করেন।

রাজা—সে পাঠ কি সকল সময়েই সত্য হয়?

বরাহ—হাঁ মহারাজ, সকল সময়েই সত্য হয়। বরাহ, কখনও ভুল গণে নাই।

রাজা—কখনও কি গণনায় ভুল হওয়া সম্ভব নয়?

বরাহ—না, মহারাজ, বরাহের গণনায় ভুল হয় না।

এ দর্প দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। কবি কালিদাস মৃদু হাসিলেন। বুঝি সেই সময়ে দর্পহারী বিধাতাও অলক্ষ্যে হাসিতে লাগিলেন।

রাজা কহিলেন—কবি আচার্য্যের কথা কি ঠিক?

কালিদাস—মহারাজ, কাল, ইহার উত্তর দিবে। প্রত্যক্ষ ভিন্ন, তর্কে ইহার সমাধান অসম্ভব।

সভা ভঙ্গ হইল।

২

বরাহাচার্য্যের পুত্র জন্মিয়াছে। আচার্য্য অতি আনন্দে মত্ত হইয়া সন্তানের অদৃষ্ট বিচার করিতে বসিলেন।

ভূর্জ্জপত্রে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া লগ্ন, দণ্ড, হোরা, দ্রেক্কাণ, অংশ, রাশি, নক্ষত্র, প্রভৃতি নির্ণয় করিলেন।

বরাহ গণিয়া দেখিলেন—জাতক, বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত, রাজদ্বারে সম্মানিত ও পিতৃবৎসল হইবে। জাতকের পত্নীস্থানে বড় শুভযোগ; স্বয়ং ভারতী, তাহার পত্নী হইবেন। আনন্দে বরাহের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল; পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণী তুমি রত্নগর্ভা, এমন পুত্র লাভ বহু তপস্যায় হয়।

কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্রাহ্মণ হায় হায় করিয়া উঠিলেন। আয়ু গণনা করিতে যাইয়া বরাহ দেখিলেন জাতকের আয়ু মোটেই দশ বৎসর। একবার, দুইবার, তিনবার গণিলেন, কিন্তু সেই দশ। বরাহ লেখনী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া মাথায় হাত দিলেন।

ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুর কি হইয়াছে, হায় হায় করিতেছ কেন?

আচার্য্য কিছু বলিলেন না। ব্রাহ্মণী, আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আচার্য্য নিরুত্তর। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার বরাহ, ভগ্নস্বরে কহিলেন, ব্রাহ্মণী, সকল আশা নির্ম্মূল হইল। জাতকের আয়ু মোটে দশ বৎসর।

ব্রাহ্মণী—তোমার গণনায় ভুল হয় নাই ত?

পুত্র তুচ্ছ, সম্পদ্ তুচ্ছ, অভিমানীর অভিমান, সকলের অপেক্ষা বড়। বরাহ, অতি অভিমানী—অতি দর্পী

ছিলেন। ব্রাহ্মণীর কথায়, তাঁহার অভিমানে আঘাত লাগিল। ব্রাহ্মণ গর্জ্জিয়া উঠিলেন—মূর্খ ব্রাহ্মণী, বলিলে কি? বরাহের গণনায় ভুল! আরে, ব্রহ্মার ভুল হইতে পারে—বরাহের লেখনীর ভুল হয় না।

কবি হইলে একটা সম্ভব অসম্ভবের চিন্তা করিত; যে রাজদ্বারে সম্মানিত, বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ও গুণবতী পত্নীর স্বামী হইবে, তাহার আয়ু দশ বৎসর সম্ভব কিনা, একবার ভাবিত। কিন্তু জ্যোতিষীর সে ভাবনা নাই। সম্ভব হউক কি অসম্ভব হউক, গণনার কথা ফলিতেই হইবে, ইহাই তাঁহার ধারণা। সুতরাং, বরাহ, সম্ভবের কথা ভাবিতে গেলেন না। গণনার ভুল, উহাত বরাহের হইতেই পারে না; বিশেষ যদি অন্যে সে ভুলের কথা বলে। বরাহ যদিও আবার গণিতেন, ব্রাহ্মণীর কথায় আর গণিলেন না। বলিলেন—ব্রাহ্মণী, ও পুত্র এখনই ত্যাগ করিতে হইবে। অনর্থক দশ বৎসর পালিয়া মায়া বাড়াইবার প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণী কেন ঠাকুর, আমাদের কাজ আমরা করিব, বিধাতার কাজ বিধাতা করিবেন। নিতে হয়, দশ বৎসর পরে তিনি লইয়া যাইবেন, তাই বলিয়া আজই বাছাকে ছাড়িব কেন? আর কোন্ প্রাণেই বা ছাড়িব? এমন

সুন্দর ছেলে! পশু পাখীতেও এমন অবস্থায় ফেলিয়া দেয় না। আমরা ত মানুষ।

আচার্য্য—হাঁ ব্রাহ্মণী, মানুষ বলিয়াই ভবিষ্যতের হাত এড়াইতে চাহিতেছি। আমি বরাহাচার্য্য, দশ বৎসরে আমার ছেলেটা মরিবে, জানিয়াও পালিয়াছিলাম, লোকে কি বলিবে?

ব্রাহ্মণী—আর ফেলিয়া দিলে লোকে কিছু বলিবেনা?

আচার্য্য—বলিবে। বলিবে, আচার্য্য পুত্রকে স্বল্পায়ু জানিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত যে একবারে অভ্রান্ত তাহাই বুঝিবে। ব্রাহ্মণী, তুমি আমার পত্নী হইয়া অদৃষ্ট মান না? জ্যোতিষ বিশ্বাস কর না?

ব্রাহ্মণী—মানি ঠাকুর। তবে তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। তুমিই না বলিলে বাছা আমার বড় পণ্ডিত হইবে, আবার তুমিই বলিতেছ, দশ বৎসর বাঁচিবে। আমি বুঝিতেছিনা বাছার অদৃষ্ট কোন্ টা?

আচার্য্য—বুঝিতেছ না? শোন, যদি বাঁচিত, তবে এইরূপ পণ্ডিতই হইত। তা যে বাঁচিবেই না।

ব্রাহ্মণী—না বাঁচিলে পণ্ডিত হওয়ার গণনাটা ত ভুল হইল। যদি এটা ভুল হইতে পারে, তবে আয়ুর গণনাটা ভুল হইতে পারে না?

আচার্য্য—কখনই না। ব্রাহ্মণী, চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্ত ভুল হইতে পারে বরাহের গণনায় ভুল হয় না। বুঝিলে ত? আর মায়া বাড়াইওনা।

বরাহাচার্য্য একখানি ভূর্জ্জপত্রে জাতকের জন্মকুণ্ডলী রাশি, নক্ষত্র, দিন, দণ্ড প্রভৃতি লিখিলেন। উহা একটি সোণার মাদুলীতে ভরিয়া শিশুর গলায় দিলেন। তাহার পরে সেই নব প্রস্ফুটিত কলির মত সুকুমার শিশুকে এক তাম্র-পেটকে শোওয়াইয়া শিপ্রার জলে ভাসাইয়া দিলেন।

পেটক, স্রোতে ভাসিয়া চলিল। ব্রাহ্মণী কান্দিতে লাগিলেন। জ্যোতিষীরও চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল। একবার বরাহের মনে হইল, হায় কেন ভবিষ্যৎ গণিতে গেলাম। যদি এ গণনা ঠিকই না হয়, এ তো বিদ্যাই বটে, আর আমিও মানুষ; ভুল যদি হইয়াথাকে। অমনি দুর্জ্জয় অভিমান আসিল,—ভুল হইবে? আমি নবরত্নের পণ্ডিত বরাহ, আমার ভুল হইবে?

পেটক, ভাসিয়া যাইতেছে, আর শিশু, উহার মধ্যে করুণ ওঙা ওঙা ধ্বনি করিতেছে। বরাহ, একদৃষ্টে সেই পেটকের দিকে চাহিয়া সেই ক্রন্দন শুনিতে লাগিলেন। অভিমানের বজ্রলেপ ফাটিয়া তাহার হৃদয়ের করুণার ধারা বাহির হইতে লাগিল।

যতক্ষণ দেখা গেল, বরাহ, একদৃষ্টে সেই পেটকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন আর দেখা গেলনা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

৩

"রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?" ভগবান্ যাহাকে রক্ষা করেন, তাহাকে কেহ মারিতে পারেনা।

শিশু মরিলনা। তরঙ্গে, সেই তাম্রপেটক ডুবিলনা। স্রোতে ভাসিয়া চলিল। ভাসিতে ভাসিতে নদী ছাড়িয়া সমুদ্রের মধ্যে রাক্ষস ভূমের ঘাটে যাইয়া থামিল।

তখন প্রাতঃকাল। রাক্ষসীরা স্নান করিতে আসিয়াছিল, তাহারা পেটক ধরিল। দেখিল, চাঁদের মত এক শিশু, উহার মধ্যে হাসিতেছে। কে রে এমন নিষ্ঠুর, এমন সোণার চাঁদ কে ভাসাইয়া দিয়াছে?—বলিতে বলিতে রাক্ষসীরা শিশুকে কোলে তুলিয়া লইল, স্তন পান করাইল। রাক্ষসীদেরও মায়া আছে।

মিহিরোদ্গমের সময়ে তাহারা শিশুকে পাইয়াছিল, এজন্য শিশুর নাম রাখিল মিহির।

সেই রাক্ষসের দেশে মানুষ ছিলনা, সবই রাক্ষস। প্রধানা রাক্ষসী শিশুটিকে কোলে লইয়া আদর করিলেন, শিশুর মুখে স্তন দিলেন, শিশু, তাহার মুখের দিকে

চাহিয়া স্তনপান করিতে লাগিল। রাক্ষসীরা বলিতে লাগিল, মানুষেরা আমাদিগকে নিষ্ঠুর বলে, কিন্তু তাহারা আমাদের চেয়েও নিষ্ঠুর, এমন সোণার কমল, জলে ভাসাইয়া দিতে পারিয়াছে।

রাক্ষসীরা জ্যোতির্বিদ্যায় পরম পণ্ডিতা ছিল। শিশু-টির দিকে কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া প্রধানা রাক্ষসী বলিল, দেখ, এর বাপ একটা মহা মূর্খ। শতায়ু ছেলে-টাকে অল্পায়ু মনে করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছে!

"ওর বাপ কোন দেশের লোক?"

"তা কি জানি?"

"তবে কিরূপে বলিলে, অল্পায়ু বলিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে?" "যে সকল ছেলে বাচিবেনা বলিয়া জ্যোতি-ষীরা বলে, উজ্জয়িনীর লোকে তাহাদিগকে এমনই করিয়া ভাসাইয়া দেয়। সেখানে বরাহ নামে একটা মূর্খ জ্যোতিষী আছে, এ তারই ব্যবস্থা। সে মনে করে, তার গণনার উপর বিধাতারও হাত নাই।

ছেলেটি কোথাকার, ওর গলার মাদুলীতে সে সব লেখা আছে। কিন্তু উহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। ও, অসহায় মানব শিশু, ইহাই যথেষ্ট। আমরা স্নেহে উহাকে পালিব। রাক্ষসীরা মিহিরকে যত্নে পালন করিতে লাগিল।

কতকদিন পরে তাহারা আর একটি মেয়েও এই-রূপে পাইল। প্রধানা রাক্ষসী বলিল, এ ডাকিনী মেয়ে। ইহাকে তোরা খনা বলিয়া ডাকিস। বড় হইলে এ দুটির বিবাহ দিব।

৪

বৎসরের পর বৎসর গেল। মিহির ও খনা, বড় হইয়া উঠিল।

রাক্ষসীরা মিহিরকে আর্য্যজ্যোতিষ, এবং খনাকে রাক্ষস জ্যোতিষ শিখাইতে লাগিল। দুইজনের শাস্ত্র দুই প্রকার, শাস্ত্রের ভাষা দ্বিবিধ।

মিহির বহু অঙ্ক পাত করিয়া—হরণ পূরণ যোগ বিয়োগের সারি গণিয়া যে গণনা করেন, খনা মুহূর্ত্ত মধ্যে মুখে মুখে তাহা বলিয়া দেয়। মিহিরের গণনায় কখনও ভুল হয়। কিন্তু খনার কথায় ভুল হয় না।

মিহির বলেন, খনা, তোমার গণনা, আন্দাজী কথার মত, কিন্তু মিলেত ঠিক। তবে যাহার বিজ্ঞান নাই, আমি সে মত-মানি না। তোমার শাস্ত্রের একটা পদ্ধতি নাই, উহা হেয়।

খনা বলে মিহির, পদ্ধতি দিয়া কি হইবে? ফল ঠিক হয় কিনা তাই দেখ।

নীল সাগরের সৈকত ভূমিতে বসিয়া দুইটি বালক বালিকা প্রতিদিন এইরূপ গণে, খেলে, হাসে, গান করে। সেই জনহীন দ্বীপে তাহারাই দুইটিমাত্র মানব।

দূরে সারি সারি অর্ণবপোত, পাল উড়াইয়া চলিয়া যায়, বালক বালিকা চাহিয়া দেখে। কোন্‌টি আগে যাইবে, তাহা লইয়া বাজি রাখে। কোন দিন মিহির হারে খনা জিতে; কোন দিন খনা হারে মিহির জিতে। হারিলে অভিমানিনী বালিকার মুখখানি ভার হয়, তখন মিহির হাসিতে হাসিতে তাহার গলা ধরিয়া অন্য কথা বলে। ফুল তুলিয়া দিয়া, শঙ্খ, শামুক, ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়া তাহার আঁচল ভরিয়া দেয়, তাহাকে শান্ত করে।

রাক্ষসীরা প্রায় প্রতিদিনই দূর দ্বীপে বা দেশে চলিয়া যায়, সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসে। বালক ও বালিকা দুইটি সারাদিন সেই নির্জ্জন দ্বীপে খেলিয়া হাসিয়া দিন কাটে।

এইভাবে মিহির ও খনার বাল্যকাল গেল, যৌবন আসিল। দুইজনই জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেন। রাক্ষসী বিদ্যা ও আর্য্যসিদ্ধান্ত অবগত হইলেন।

রাক্ষসীরা এক শুভদিনে মিহির ও খনার বিবাহ দিল।

৫

অসীম নীলসিন্ধুর তীরে বসিয়া দুইটি কিশোর ও কিশোরী এক দিন প্রভাতে কথোপকথন করিতেছিল। তখন সূর্য্যদেব, সাগর জলে স্নান করিয়া কেবল আরক্ত বসন পরিতেছেন, নীল আকাশে মেঘগুলি ছুটিয়া চলিতেছে, বনে বনে পাখীগুলি মধুরস্বরে ডাকিতেছে। মধুর প্রভাতে লতায় লতায় ফুল, ফুলে ফুলে গন্ধ। বাতাস, জল, আলোক, সাগর, সাগরের ফেণ ও ঊর্ম্মি—সবই সুন্দর।

মিহির বলিলেন, "খনা, আমার গলার এই মাদুলীর ভিতরে আমি কে তাহা লেখা আছে।"

"পড় দেখি।"

মিহির মাদুলী খুলিয়া ভূর্জ্জপত্র বাহির করিলেন। পড়িলেন ঃ—

"উজ্জয়িনী নিবাসি বরাহাচার্য্যস্য প্রথমো তনয়ো-জাতঃ। তস্য জন্ম লগ্নাদি—"

"বেশ বেশ, বুঝা গেল, উজ্জয়িনীর সেই প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহাচার্য্য তোমার পিতা; যাঁহার নাম, মাঝে মাঝে রাক্ষসীরা বলে।"

"হাঁ, খনা, তাই—ই।"

"তবে তিনি তোমাকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন কেন?"

"তাহাও এই ভূর্জ্জপত্র পড়িলেই বুঝা যায়।"

"কি লেখা আছে?"

মিহির পড়িলেন—"জাতকের আয়ু দশ বৎসর। এজন্য ইহাকে তাম্র-পেটকে স্থাপিত করিয়া ভাসাইয়া দিলাম। যদি কোন দৈববলে ইহার প্রাণ রক্ষা হয়, পরম পণ্ডিত হইবে।"

"দশ বৎসর আয়ু? সে কি?"

"খনা, পিতার ভুল হইয়াছিল। তিনি যে জাতচক্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে জাতকের আয়ু একশত বৎসর দেখা যায়। পিতার গণনায় একটি শূন্যের ভুল হইয়াছিল।

"বল কি? শূন্যের ভুলে এত প্রমাদ!"

"হাঁ খনা, তাহাই ঘটিয়াছিল। অদৃষ্ট বলবত্তর। গণনায় অদৃষ্ট ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না; মানুষ, কোন বিদ্যাতেই দৈব অতিক্রম করিতে পারে না।,'

"তাই কি স্বামিন্।"—এখন আর খনা, মিহির বলিয়া ডাকে না।

"তাই-- ই খনা।"

খনার মুখ যেন শুকাইয়া গেল। মিহির বলিলেন, খনা এমন হইলে যে?

খনা, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

মিহির আকুলকণ্ঠে কহিলেন—"খনা, খনা,—কিসের বেদনা, খনা? কেন এমন হইলে? পিতার সন্ধান পাইয়াছি ইহাতে তুমি বিষণ্ণ হইলে কেন?"

"না, স্বামিন্, উহাত আনন্দের সংবাদ, উহাতে বিষণ্ণ হইব কেন?"

"তবে কি খনা?"

"তা তুমি না শুনিলেই ভাল হয়।"

"ভাল হইতে পারে কিন্তু আমি না শুনিয়া থাকিতে পারিব না। তুমি বল।"

"আমি অদৃষ্ট গণনা করিতে শিখিয়াছি। রাক্ষসীরা কাল আমাকে সে বিদ্যা শিখাইয়াছে।"

"উত্তম।"

"আমি, আমার, অদৃষ্ট গণনা করিয়াছি।"

"কি দেখিলে?"

"দেখিলাম, তোমার হাতে আমার মৃত্যু।"

"বল কি খনা; ইহাও কি সম্ভব? তুমি আমার প্রাণ, প্রাণের অধিক খনা; আমি তোমাকে প্রাণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিব।"

"তা রাখিবে জানি কিন্তু অদৃষ্ট এড়াইতে পারিবেনা।

তা হউক, মৃত্যুত অবধারিত আছেই ; তোমার হাতে মরিলে সে মরণ বরং আমার মঙ্গল।"

"না খনা, এমন গণনা আমি বিশ্বাস করিনা। তুমিও করিওনা। তুমি যে আমার প্রাণ।" এই বলিয়া মিহির খনার মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।"

খনা দেখিল, অদৃষ্টের কথা বলিয়া স্বামীর প্রাণে ব্যথা দিয়াছে ; অন্য কথা পাড়িল। কথায় কথায় বেলা হইল, দুইজনে উঠিয়া গৃহে গেল।

মিহির ভাবিল,—অদৃষ্ট কি অতিক্রম করা যায় না? খনা ভাবিল,—যা ঘটিবার তা ত ঘটিবেই, ভাবিয়া ফল কি?

৬

অপরাহ্ণ ; দূর সাগরের জলে অর্ণবপোত একটির পর একটি যাইতেছিল, পাখীগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে এক দ্বীপ হইতে উড়িয়া আর এক দ্বীপে যাইয়া বসিতেছিল— মিহির ও খনা সাগরের কূলে বসিয়া তাহাই দেখিতেছিলেন।

সাগরের জল শোঁ শোঁ রবে ঢেউয়ের পরে ঢেউ তুলিয়া কূলে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে ; ফেণের পর

ফেণের মালা, নাচিতে নাচিতে আসিয়া থামিতেছে—সকলেরই যেন একটা কাজ আছে। কাজ নাই কেবল খনা ও মিহিরের।

এমনই ভাবে সাগরের নীল দেখিয়া আর দিন যায় না, হোরা দ্রেক্কাণ আর ভাল লাগে না। মিহির ডাকিলেন—'খনা'

"কি, স্বামিন্"

"এমনই ভাবে এই নিষ্কর্ম্মা জীবন লইয়া আর কতদিন এ রাক্ষস দেশে থাকিব?"

"আমাদের আর যাইবার স্থান কোথায়?"

"কেন? চল. পিতার নিকট যাই।"

"উজ্জয়িনীতে?"

"হাঁ।"

"উজ্জয়িনী. কোথায়?"

"তুমি জাননা খনা? জ্যোতিষ পড়িয়া কেবলই কি আকাশের কথা শিখিলে? ভূ-সংস্থান পড় নাই? আর্য্য-সিদ্ধান্তে ভূ-সংস্থানের কথা আছে। আমি পড়িয়াছি। যে দ্রাঘিমা ধরিয়া দেশ নির্ণয় হয়, আর্য্যেরা উজ্জয়িনী হইতে সেই দ্রাঘিমার গণনা আরম্ভ করেন। রাক্ষসেরা লঙ্কা হইতে গণে।

উজ্জয়িনীর দ্রাঘিমা ও অক্ষ জানি। সেখানে যাইতে পারিব। একবার এই সাগর পার হইতে পারিলেই হয়।”

“কিরূপে পার হইবে? অর্ণব-যান ত এ রাক্ষসের দেশে আসেনা। আর রাক্ষসীরা জানিলেইবা আমাদিগকে যাইতে দিবে কেন?”

“তা ঠিক।”

“চল, আমরা একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গী গড়িয়া নৌকা বাহিতে শিখি। রাক্ষসীরা জানিতে পারিবেনা। জানিলেও ভাবিবে, আমরা এই খেলা খেলিতেছি। তাহার পরে একদিন সুযোগ দেখিয়া সেই নৌকায় সাগর পার হইব।”

তাহাই হইল। খনা ও মিহির, নৌকা চড়িয়া প্রতিদিন বাহিতে লাগিল। কখনও বৈঠা বাহিয়া, কখনও পাল তুলিয়া তাহারা নিকটের দ্বীপগুলিতে যায়, আবার ফিরিয়া আসে। ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল, বাহিবার কৌশল অভ্যস্ত হইল।

৭

রাক্ষসী ডাকিল,—খনা,

খনা, উত্তর করিল—বল মা।

"এই যে শুক শিকল কাটিয়া উড়িয়া যাইতে চায়, এ দোষ কার মা?

"শুকের।

"না, মা, যে, ওকে বন্দী করিয়াছে, তারই দোষ।"

"কেন মা, তার দোষ কি? এমন যত্ন, এত আদর, তা ফেলিয়া যাইতে চায়, অকৃতজ্ঞ নয় কি?"

"ও, বনের পাখী, বনই ওর ভাল। সোণার খাঁচা, সোণার সিকল,—তা সোণার হউক, খাঁচা আর শিকল ত বটে; এটা ওর বন্ধন। ও চায় মুক্তি, ও চায়, ওর জাতভায়াদের কাছে যাইতে, বাপের সেই গাছের কোটরে।"

পাখী ত পাখী। সবাই ইহা চায়। মমতায় বান্ধা কেউ পড়েনা মা! পরের মমতা, সবাই পর বলিয়া পায়ে দলিয়া যায়।

খনা, রাক্ষসীর কথা বুঝিল; বুঝিয়া একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল।

রাক্ষসী বলিল, তুইও কি মা এমনই উড়িয়া যাইবি? খনা কিছু বলিতে পারিলনা।

সেইদিন বিকালে খনা কহিল স্বামিন্,—আমরা যে এখান হইতে যাইতে চাই, রাক্ষসীরা তাহা জানিয়াছে।

"কিরূপে জানিল ?"

"কেন, তাহারা যে গণনা জানে।"

"জানুক। আমরা মাহেন্দ্র ক্ষণে যাত্রা করিব। কল্য প্রভাতেই খনা, আর এখানে থাকিবনা।"

"এত মমতা ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ যেন কেমন করে।"

"কেন, তুমি কি যাইতে চাওনা খনা ?"

"যাইব।"

পরদিন মাহেন্দ্র ক্ষণে পুথি পাঁজি সহ খনা মিহির, তাহাদের ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিয়া পাল তুলিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র ডিঙ্গী দ্বীপের পর দ্বীপ ছাড়াইয়া উত্তরমুখে ছুটিল।

এক দূর দ্বীপে রাক্ষসেরা আহার অন্বেষণে গিয়াছিল। প্রধানা রাক্ষসী সেখানে খড়ি পাতিল। গণিয়া বলিল, খনা ও মিহির চলিয়া যাইতেছে। রাক্ষসেরা অমনি তাহাদিগকে ধরিবার জন্য দাঁড়াইল। রাক্ষসী বলিল, না—না—ধরিয়া কাজ নাই। তাহারা মাহেন্দ্রক্ষণে পা বাড়াইয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে ধরিতে পারিবেনা। ধরিলেও রাখিতে পারিবেনা। মায়ার বান্ধ, যাহারা ছিঁড়িয়াছে, তাহাদিগকে জোর করিয়া রাখিয়া ফল কি ?

৮

ডিঙ্গী, সাগরের উত্তর কূলে আসিয়া পঁহুছিল। মিহির বলিল খনা, এই আমাদের পিতৃভূমি ভারতবর্ষ। তুইজনে পুথি পাঁজি লইয়া তীরে নামিলেন।

খনা, বলিলেন, স্বামিন্—এ যে সোণার দেশ ; এই শ্যামল ভূমিতে শান্তি যেন ছড়াইয়া রহিয়াছে।

দূরে একটা গাভী চরিতেছিল। গাভী, আসন্ন প্রসবা। মিহির বলিলেন, খনা, বল দেখি গাভীর কখন সন্তান হইবে?

খনা, একটু ভাবিয়াই বলিল,—আর তুইদণ্ড বত্রিশ পল পড়ে। তুমি বলদেখি উহার বৎস কোন্ বর্ণের হইবে?

মিহির, খড়ি পাতিলেন. অঙ্ক কষিলেন, অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, বৎস শ্বেতবর্ণ হইবে।

"খনা, ভারতবর্ষে আসিয়া এই আমাদের প্রথম বিদ্যার পরীক্ষা। তুইদণ্ড অপেক্ষা করি, দেখি, কাহার কথা সত্য হয়।"

তুই জনে এক বৃক্ষের ছায়ায় বসিলেন। দেখিতে দেখিতে তুই দণ্ড গেল। আর বত্রিশ পল বাকী। গাভীর প্রসব বেদনা হইল, বত্রিশ পল পূর্ণ হইতেই গাভী

একটি বৎস প্রসব করিল। খনা বলিলেন, দেখ, আমার গণনা, ঠিক হইয়াছে। মিহির বলিলেন, হাঁ খুবই ঠিক হইয়াছে। বলিতে বলিতে দুইজনে গাভীর নিকটে গেলেন। মিহিরের মুখ শুকাইল, একি, বৎস যে কৃষ্ণবর্ণ!

মিহির বলিলেন, খনা, বুঝিলাম, এতদিন যে শাস্ত্র পড়িয়াছি, সবই মিথ্যা। আমার গণনা ঠিক হয় নাই। মিছা এ পুঁথির বোঝা বহিব কেন? এই বলিয়া মিহির কতকগুলি পুঁথি সাগরের জলে নিক্ষেপ করিলেন।

খনা, মিহিরের হাত ধরিয়া উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন —স্বামিন্ করিলে কি?

"মিছা, এ মিথ্যা গণনার পুঁথির বোঝা বহিব কেন?"

"গণনা মিথ্যা হয় নাই, স্বামিন্। ঐ দেখ, গাভী, বাছুরের গা চাটিতেছে, আর সাদা হইতেছে।"

সত্যইত। মিহির স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ক্ষণ পরে বলিলেন—খনা, করিলাম কি? এমন দুর্লভ বিদ্যার পুঁথি ফেলিয়া দিলাম? আর উহা মিলিবেনা।

খনা বলিলেন—স্বামিন্, মানুষ ভুল করিয়া এমনই অঘটন ঘটাইয়া ফেলে। এখন অনুশোচনা করিয়া ফল কি? যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবেনা।

স্বামিন্, ইহারই নাম অদৃষ্ট। বিদ্যায় বা বুদ্ধিতে অদৃষ্ট ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

৯

যুবক ও যুবতী পথে চলিয়াছেন, পথ আর ফুরায় না; উজ্জয়িনী এখনও অনেক দূরে।

সেকালে গ্রামে গ্রামে ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী ছিল। মিহির ও খনা যে গ্রামে যান, চতুষ্পাঠীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় তাহাদের অসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া সকলে বিস্মিত হয়, আদর করে।

বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ দিয়া অনেক দিন পরে খনা ও মিহির, অবন্তী দেশে প্রবেশ করিলেন।

মিহির দেখিলেন, অবন্তীর গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধগণ, বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া উদয়ন্ রাজার কাহিনী, বালক ও যুবক দিগের নিকট বলিতেছে। রাখালেরা রাণী হংসপদিকার গান গাইতেছে, কুলবধূরা কলসী কক্ষে লইয়া ঘটকর্পর ও কালিদাসের কবিতা আবৃত্তি করিতেছে। মিহির বলিলেন খনা, এ দেখিতেছি ভারতীর দেশ। খনা, অবাক্ হইলেন।

মিহির, পথে যাহাকে উজ্জয়িনীর কথা জিজ্ঞাসা করেন, সে ই বলে, ঠাকুর, উজ্জয়িনীত,——

"শেষৈঃ পুণ্যৈঃ হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকং" স্বর্গের একখানি টুকুরা। আপনি উজ্জয়িনী যাইবেন? তা যান। উজ্জয়িনী যে না দেখিয়াছে, তাহার চক্ষু বিফল। সেখানে ভারতী ও কমলা, নবরত্ন সভায় নর্ত্তকী হইয়া রহিয়াছেন।

গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া মিহির ও খনা, শিপ্রার তীরে আসিলেন। ওপারে উজ্জয়িনী। এ পার হইতে সেই সুন্দর নগরী, রত্নালঙ্কার ভূষিতা রাজলক্ষ্মীর ন্যায় দেখা যায়।

মিহির, আপনার জন্মভূমিকে প্রণাম করিলেন, উদ্দেশে পিতামাতার চরণে প্রণতি জানাইলেন। তাহার পরে শিপ্রা পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

কমনীয় কান্তি তরুণ ও তরুণী। দুইয়ের মুখেই দিব্য প্রতিভার জ্যোতি। সে জ্যোতি দেখিয়া সেই প্রতিভার দেশের লোকেও চাহিয়া রহিল। মিহিরের হস্তে পুথি, উহা দেখিয়া কেহ বলিল, পণ্ডিত; দিগ্‌বিজয়ে আসিয়াছেন। কেহ ভাবিলেন পড়ুয়া; বরাহ কি কালিদাসের কাছে, পড়িতে আসিয়াছেন।

পণ্ডিত ও পড়ুয়া, নিত্যই উজ্জয়িনীতে আসিত। রাজসভার দ্বার, পণ্ডিত ও পড়ুয়ার জন্য অবারিত ছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের আদেশ ছিল, পণ্ডিত দেখিলেই দ্বারী, সসম্মানে সভায় পঁহুছাইয়া দিবে, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেনা, অনুমতি আবশ্যক হইবে না।

মিহির ও খনা, রাজ সভার দ্বারে পঁহুছিলেই দ্বারী, তাঁহাদিগকে সভাগৃহে লইয়া গেল। সে সভার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মিহির বিস্মিত হইলেন, খনা, লজ্জানতবদনে মিহিরের উত্তরীয় প্রান্ত ধরিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।

মিহির, হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বচন পাঠ করিলেন। বিক্রমাদিত্য দেখিলেন, নূতন পণ্ডিত, মুখে দীপ্ত প্রতিভা। পণ্ডিতেরা যুবক ও যুবতীর দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এ কে? এই দ্বিতীয় ভারতীর ন্যায় তন্বী শ্যামাই বা কে? ভারতে এমন কোন নারী আছে, তাহা ত জানিনা।

রাজা, আদর করিয়া বসিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কোন্ শাস্ত্র-ব্যবসায়ী?

মিহির বলিলেন—মহারাজ, কিছুদিন জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছি।

রাজা—আপনার সঙ্গিনী এই মূর্ত্তিমতী ভারতীর মত মহিলা কে?

মিহির—উনি আমার পত্নী। উনি জ্যোতিষে পণ্ডিতা।

রাজা—উত্তম। আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় লইয়া বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিব। বিচার হউক।

মিহির—কাহার সহিত বিচার হইবে, মহারাজ।

রাজা—আমার নবরত্নের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ বরাহাচার্য্যের সহিত।

মিহির—ক্ষতি ছিলনা। কিন্তু উনি বৃদ্ধ, উহাঁর গণনায় ভুল হয়। বিচারের বয়স উহাঁর নাই।

সেই মূহূর্ত্তে সভাগৃহে বজ্রপাত হইলেও বুঝি লোকে এত বিস্মিত হইত না। উজ্জয়িনীর নবরত্ন সভা, সেখানে এমন প্রগল্‌ভ বাক্য; তাহাও আবার অভিমানী বরাহাচার্য্যের সম্বন্ধে! সভা স্তব্ধ হইল। রাজা বরাহের মুখের দিকে চাহিলেন।

পদ-দলিত মহাফণীর ন্যায় বরাহের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আচার্য্য, কর্কশ স্বরে কহিলেন, সাবধান যুবক, এ রাজসভা; এখানে প্রগল্‌ভতার দণ্ড আছে, জান?

"জানি।"

"বরাহের গণনায় ভুল?"

"হাঁ, সেই মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য বড়ই ভুল করেন। সে ভুলে অন্যেত ভোগেই, তাঁহাকেও ভুগিতে হয়।"

বরাহ, ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইলেন ;—চীৎকার করিয়া কহিলেন—"ভুল, প্রমাণ করিতে পার ?"

"পারি।"

"কর।"

"আপনার পুত্র জন্মিয়াছিল ?"

"জন্মিয়াছিল, সে ত বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা।"

"সে পুত্র কোথায় ?"

"তাহাকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছি।"

"কেন ?"

"তাহার আয়ু মোটেই দশ বৎসর ছিল। তাই পালন করি নাই। হায় যুবক, তুমি সে কথা কেন তুলিলে ?"

"প্রয়োজন আছে। আপনার ভুল হইয়াছিল।"

আবার বরাহের চক্ষু দীপ্ত হইল—"কি ভুল ?"

"তাহার আয়ু দশ বৎসর নহে। শত বৎসর।"

"মিথ্যা কথা।"

"মিথ্যা নহে। তাহার জাতক চক্র আছে ?"

"আছে।"

"আনুন।"

বরাহ সেই পুত্রের জাতক চক্র আনিলেন। সভায়

বসিয়া আবার গণিলেন। এবারও সেই দশ বৎসরই আয়ু। যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কোথায় ভুল দেখাইতে পার ?"

"পারি। আপনি দশকের গুণে একটি শূন্য—লিখিতেছেন না। তখনও লিখেন নাই, এখনও না। এই শূন্যের ভুলে আপনি বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন।"

বরাহের দেহে বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। হায় হায় সত্যই ত ভুল। হায় কি করিয়াছি ? কাতর কণ্ঠে বরাহ বলিলেন—মহারাজ আমি পুত্রঘাতী, সত্যই আমার ভুল।

মিহির বলিলেন—"না—না আচার্য্য, আপনি পুত্র-ঘাতী নহেন। আপনার ভুল হইয়াছিল, কিন্তু দৈবের ভুল হয় নাই। আপনার পুত্রের ভাবী ফল কিছু বিচার করিয়াছিলেন ?"

"করিয়াছিলাম।"

"কি দেখিয়াছিলেন ?"

"পুত্র দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হইবে।"

"যে দশ বৎসরে মরিবে, সে কিরূপে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হইবে, এ কথাটার সম্ভব অসম্ভব বিচার করেন নাই ?"

বরাহ, যুবকের দিকে বিস্মিতের মত চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। ক্ষণ পরে গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন—"না, যুবক, তাহা করি নাই। করিলে বুঝি, আমি পুত্রঘাতী হইতাম না। ব্রাহ্মণী, অকালে পরলোকে যাইতেন না।"

"হায় মা নাই"—বলিয়া মিহির কাঁদিতে লাগিলেন।

"এ কি, এ কে? বাছা তুমি কে?"

"আমি আপনার সেই হতভাগ্য পুত্র। ইনি আপনার পুত্রবধূ।"

ব্যাকুলভাবে বরাহ, মিহিরকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন—যুবক, আপনি যে বরাহাচার্য্যের পুত্র, তাহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু কিছু প্রমাণ আছে কি?

"আছে, মহারাজ।" এই বলিয়া মিহির, আপনার গলার মাদুলী রাজার হাতে দিলেন।

বরাহ বলিলেন, মহারাজ, এই মাদুলী গলায় পরাইয়া দিয়াই বাছাকে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। ঐ মাদুলীর মধ্যে ভূর্জ্জপত্রে বাছার জাতক চক্র লিখিত আছে।

রাজা, মাদুলী খুলিলেন। সত্যই উহার মধ্যে বরাহের স্ব অক্ষরে জাতকচক্র লিখিত।

রাজা বলিলেন—যুবক, কিরূপে তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছিল, বলিতে পার কি ?

মিহির আপনার ও খনার সমুদয় বিবরণ বলিলেন। শুনিয়া রাজা বলিলেন, আজি হইতে তুমি আমার সভার রত্ন হইলে। কিন্তু এ সভা নবরত্ন, দশরত্ন হইতে পারে না। তুমি ও তোমার পিতা দুইয়ে আমার অষ্টম রত্ন হইলে।

পুত্র ও বধূ লইয়া বরাহাচার্য্য গৃহে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিতেই বৃদ্ধের চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। হায় রে আজ সে নাই। কে এই নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে লইয়া যায়। ব্রাহ্মণীর জন্য বৃদ্ধ আচার্য্যের অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

বরাহ চলিয়া গেলেন। সভা ভঙ্গের সময় আসিল। কালিদাস বলিলেন—মহারাজ বিশ বৎসর পরে একটা কথার মীমাংসা হইল।

রাজা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কথা কবি ?

"সেই যে, বিশ বৎসর আগে একদিন তর্ক হইয়াছিল ভবিষ্যৎ কে বলিতে পারে ?"

"হাঁ হাঁ মনে হইতেছে। বরাহ বলিয়াছিলেন, তাঁহার গণনায় ভুল হয় না।"

"হাঁ, মহারাজ, সেই কথাই বটে।"

"মীমাংসা হইল বটে কিন্তু দেখিতেছি, অদৃষ্ট বড়ই কঠোর। কি বিষম ভুল!"

১০

খনা, শ্বশুর গৃহে আসিয়া বধূ হইলেন, গৃহিণী হইলেন। যতক্ষণ মিহির গৃহে থাকেন, ততক্ষণ খনা, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া, শাস্ত্রালাপ করিয়া প্রফুল্ল থাকেন কিন্তু মিহিরকে রাজ সভায় যাইতে হয়, সকল সময় গৃহে থাকিতে পারেন না। মিহির গৃহে না থাকিলে খনা বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার সেই সমুদ্রের কূল আর রাক্ষসের দেশের কথা মনে পড়ে। খনা ভাবেন, আবার সেখানে গেলে হয় না?

মিহির, পত্নীকে সুখী করিতে আপনার হৃদয়ের সমগ্র যত্নটুকু উৎসর্গ করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজসভায় কথা হইল—এতকাল গেল আকাশে কত নক্ষত্র আছে, এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হইল না। আমাদের পণ্ডিতেরা গোটা কয়েকের নাম মাত্র বলিতে পারেন। কিন্তু মোটে কত, কেহ নির্ণয় করেন নাই।

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—বরাহাচার্য্য, নক্ষত্রের সংখ্যা নির্ণীত হইতে পারে কি?

মিহিরের মুখের দিকে চাহিয়া সাহসে ভর করিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য বলিলেন—"পারে বই কি মহারাজ।"

"তবে কাল সভায় আপনি বলিবেন, আকাশে কত তারা আছে।"

"বলিব।"

সে দিন সভা ভঙ্গ হইল। বরাহ ও মিহির গৃহে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে বরাহ বলিলেন "বাছা, আকাশের নক্ষত্র গণিবার কোন সঙ্কেত জান কি?"

"না বাবা। যে কয়েকটার নাম পাইয়াছি, মাত্র তাহাই জানি। মোট কত তারা বলিতে পারিনা।"

"তবে উপায়? কাল ত বলিতেই হইবে।"

বরাহ ভাবিতে ভাবিতে গৃহে আসিলেন, আসিয়াই পুথি পাঁজি লইয়া বসিলেন, স্নান আহারের কথা ভুলিয়া গিয়া পুথির পর পুথির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, কোন গ্রন্থেই সে সঙ্কেত নাই। অভিমানী বৃদ্ধ আচার্য্যের মুখ শুকাইয়া গেল।

এ দিকে খনা, রন্ধন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু শ্বশুর ও স্বামী আহার করিতে আসিতেছেন না। খনা অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, মিহিরের নিকট গেলেন,

জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ ঠাকুর, আহার করিতে এত বিলম্ব করিতেছেন কেন?

মিহির বলিলেন—খনা. বাবা বড়ই চিন্তায় পড়িয়াছেন। আকাশে কত তারা আছে, কাল রাজসভায় উহা বলিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কোন পুথিতে তারা গণিবার সঙ্কেত পাইতেছেন না। আমিও পাইতেছিনা।

খনা হাসিলেন—"এই কথা?"

"কেন, এটা খুব সহজ কথা নাকি? কোন পুস্তকেও উহার সঙ্কেত পাইনা। তুমি কি জান, বল?" "আমি যাহা জানি, শ্বশুর ঠাকুরকে বলিতেছি।" এই বলিয়া খনা, ঘরের বাহির হইয়া বলিলেনঃ-

"চাইর চৌদ্দ আরো চাইর
চুয়াল্লিশের ভারা,
ভাত খাও এসে খনার শ্বশুর
স্বর্গে এত তারা।"

বরাহ, মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মাথার একটা বোঝা যেন নামিল। প্রফুল্লমুখে কহিলেন—কি বলিলে মা—
খনা আবার বলিলেন—

"চাইর চৌদ্দ আরো চাইর
চুয়াল্লিশের ভারা,
ভাত খাও এসে খনার শ্বশুর
স্বর্গে এত তারা।"

আনন্দে বরাহ কহিলেন—"বাচালি মা। কাল আর সভায় মুখ থাকিত না। এখন ভাত খাইব বই কি? তুই স্বয়ং সরস্বতী। আমার মিহিরের কোষ্ঠীর ফল এই-রূপই, তা জানি। কিন্তু মা, যদি কেহ বলে কি হিসাবে গণিলে, কি বলিব?"

"তা আপনাকে বলিতে হইবেনা। রাজা ত কত নক্ষত্র, কেবল এই কথাই জানিতে চাহিয়াছেন. কিরূপে গণিলেন, সে কথা চাহেন নাই। যদি কেহ আপনার গণনা, স্বীকার না করে, সে-ই গণিয়া দেখাক যে ভুল হইয়াছে।"

"ঠিক বলিয়াছিস মা। এই কথাই বলিব।"

প্রফুল্লমুখে আচার্য্য. পুত্রকে লইয়া আহার করিতে বসিলেন।

১১

পরদিন রাজসভায় প্রথমেই বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—আচার্য্য, তারার সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে কি?

বৃদ্ধ প্রফুল্লমুখে বলিলেন—হাঁ মহারাজ হইয়াছে। নবরত্ন সভা। সভার রত্নেরা সকলেই সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী। একএক শাস্ত্রে পারদর্শী।

বৃদ্ধ আচার্য্য যখন বলিলেন, "হাঁ মহারাজ হইয়াছে," তখন এ উহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। আকাশের তারা নির্ণয়—অদ্ভুত আবিষ্কার! এ বৃদ্ধ বয়সেও আচার্য্যের প্রতিভা জগজ্জয়ী!

রাজা আগ্রহ সহকারে বলিলেন—বলুন, তারার সংখ্যা কত? আচার্য্য বলিলেন, মহারাজ, তারার সংখ্যা :—

"চাইর চৌদ্দ আরো চাইর,
চুয়াল্লিশের ভারা।"

রাজা বলিলেন—এতে কত হইল?

কত হইল, বরাহ ত সে হিসাব করেন নাই। যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনই কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, আর তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছেন। মোট কত হইল গণিয়া দেখেন নাই। এবার গণিতে লাগিলেন।

একজন পণ্ডিত বলিলেন, মহারাজ, ইহাও একটি শ্লোকের একাংশ, অপরাংশ আচার্য্য বলিলেন না।

বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচার্য্য, এ শ্লোকাংশ আপনার রচিত?"

"না মহারাজ, আমার রচিত নহে।"

"ইহার অপরাংশ বলুন দেখি।"

এবার বরাহ প্রমাদ গণিলেন। অপরাংশ বধূর উক্তি। সে উক্তির মধ্যে বরাহের অকৃতার্থতা যে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বরাহ, উহা বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সহসা বলিতে পারিলেন না।

রাজারও উহা শুনিবার জন্য আগ্রহ বাড়িল। রাজা বলিলেন, আচার্য্য, অপর অংশটুকু বলুন, শ্লোকটি পূর্ণ হউক।

অগত্যা বরাহকে বলিতে হইল :—

"ভত খাও এসে খনার শ্বশুর
স্বর্গে এত তারা।"

বলিতে যাইয়া বরাহের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল।

পণ্ডিতগণ, এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। কেহ অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, এ গণনা তবে আচার্য্যের নয়, আচার্য্যের বধূর। বধূর বিদ্যায় আচার্য্যের মান, আজ রক্ষিত হইল।

কথাগুলি বরাহ না শুনিলেন এমন নহে কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল, বুঝি ইহা অপেক্ষা গণনা করিতে না পারাও ভাল ছিল, ইহাত

মান রক্ষা নহে, অপমানের একশেষ। হায় কি করিলাম! বরাহের মুখ, পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—আচার্য্য, ইহা কি আপনার বধূর রচিত?

বরাহ নিরুত্তর।

রাজা বুঝিলেন, আজ আচার্য্যের অভিমানে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। সহৃদয় রাজা, বৃদ্ধের জন্য ব্যথিত হইলেন বলিলেন,আচার্য্য, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে? লোকে পুত্র ও শিষ্যের নিকটেই কেবল পরাজয় কামনা করে। আপনার বধূ, আপনার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সেই বিদুষীকে এই মুক্তার মালা পুরস্কার দিলাম। এই বলিয়া রাজা, একছড়া মুক্তার মালা, বরাহের হাতে দিলেন। অভিমানী বৃদ্ধ,কম্পিত হস্তে রাজার দান লইলেন।

সভা ভঙ্গ হইল। গৃহে যাইতে যাইতে বরাহ ডাকিলেন—"মিহির।"

"কি, বাবা"

"শোন, মানুষের অভিমান, প্রাণের অপেক্ষা বড়, পুত্রের অপেক্ষা প্রিয়, বিত্তের অপেক্ষা মূল্যবান। পুরুষ, অভিমানের জন্য সকল ছাড়িতে পারে। আমার সে অভিমান, আজ ধূলিতে মিশিয়া গেল।"

"কেন, বাবা ?"

"বুঝিতেছ না ? লোকে বলিতেছে, এক বালিকা আজ বরাহাচার্য্যের মান রাখিল।" "সেত বাবা তোমারই বধূ।"

"তা, ঠিক।"

"তোমার বধূ, তোমার মান রাখিবেনা, কে রাখিবে বাবা ?"

"তা ও ঠিক। মা আমার স্বয়ং ভারতী। তবে কিনা বাবা, আমি বরাহাচার্য্য, আমি যা পারিলাম না, এক বালিকা তাই পারিল। আর তারই কথা বলিয়া আমি এত পণ্ডিতের সম্মুখে রাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়া আসিলাম। আমি রহিলাম কই, বাবা ?

"ও কবিতাটা না বলিয়া কেবল সংখ্যাটা বলিলেই হইত।"

"সে কথা আগে মনে হয় নাই। ভুলে হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছি। ভাবি নাই।"

বরাহ গৃহে আসিলেন, স্নানাহার করিলেন, কিন্তু আহত অভিমানের জ্বালা তাঁহার নিভিলনা। বরাহ বড়ই অভিমানী, আর দর্পী ছিলেন। নবরত্নের অনেকেরই এক এক শাস্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ অহঙ্কার ছিল।

১২

নবরত্ন সভায় খনার নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। যাহা কেহ পারে নাই, খনা, সেই সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন।

এখন জ্যোতিষের সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলেই নবরত্নের পণ্ডিতেরা খনার মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। খনা, সে সকল প্রশ্নের এমন উত্তর দেন যে, সকলে অবাক্ হইয়া যায়।

খনার গণনা সরল, নির্ভুল। আর্য্য জ্যোতিষে খনার মত গৃহীত হইল। পণ্ডিতেরা খনার বচন কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলেন। খনার প্রতিভায় আর্য্যজ্যোতিষিগণের যশ ম্লান হইয়া পড়িল।

আর্য্যভূমে রাক্ষস সিদ্ধান্তের প্রচারে, খনার একটা আনন্দ ছিল। সিদ্ধান্তের প্রচার হইলে, খনার সে আনন্দও শেষ হইয়া আসিল।

একদিন খনা মিহিরকে বলিলেন, "স্বামিন্, মানুষের আয়ুর একটা পরিমাণ আছে।"

"আছে। কি বলিতে চাও খনা?"

বলিতে চাই, আমারও আয়ুর একটা পরিমাণ আছে। সে পরিমাণ, প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

তুমি আমার বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গী, যৌবনে স্বামী ; তোমার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি, সে সব ক্ষমা করিও। এ কথা শেষ সময়ে আমার বলিবার অবসর হইবে না, তাই বলিয়া রাখিলাম। খনার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

মিহিরের বুক কাঁপিয়া উঠিল। হায়, খনা এ কি বলে ? আকুল কণ্ঠে মিহির বলিলেন—"এ কি কথা খনা ? তুমি আমার প্রাণ ; আমি প্রাণ দিয়া তোমাকে ঢাকিয়া রাখিব।"

"তা রাখিবে স্বামিন্, কিন্তু অদৃষ্ট বড় কঠোর। অদৃষ্টের ফলে বাধা দিতে পারিবেনা। খনার অদৃষ্ট ফলিবে। শোন, বিদ্যা আমার কাল হইয়াছে। শ্বশুর মুখে আমায় ভারতী বলেন, কিন্তু অন্তরে ভাবেন, ডাকিনী। তিনি পিতা, দোষ তাঁর নয়। দোষ, খনার অদৃষ্টের। খনার বচন, তাঁহার অভিমানে আঘাত করিয়াছে।"

"তা বাবাকেও ত তোমার যশে খুব সুখীই দেখি।"

"সে টাও মিথ্যা নয়। যখন তিনি ভাবেন, খনা তাঁরই বধূ, তখন তাঁর আনন্দ হয় বই কি ? কিন্তু যখনই মনে হয় লোকে আর তাঁহার সংহিতা পড়িতে চায়না, নবরত্ন সভায় আর তাঁহার মত তেমন শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হয় না, লোকে খনার বচন আবৃত্তি করে, খনার মত

জানিতে চায়, তখন তাঁহার অভিমান, কাল সর্পের মত ফণা তুলিয়া খনাকে দংশন করিতে চাহে। খনা ইহলোকে থাকিতে তাঁহার শান্তি হইতে পারেনা। বড় কঠোর কথা, বড়ই অপ্রিয় কিন্তু বড়ই সত্য কথা।”

মিহির ভাবিতে লাগিলেন। খনা, গৃহকার্য্যে গেলেন।

১৩

বৃদ্ধ আচার্য্য একমনে কি গণিতেছিলেন আর ভূর্জ্জ-পত্রে কঞ্চীর কলম দিয়া লিখিতেছিলেন। আহারের সময় বহিয়া যায়, খনা ডাকিলেন—

“ঠাকুর, কি করিতেছেন?”

“একটি জাতকের আয়ু গণিতেছি মা।”

“অন্ন প্রস্তুত। আহার করিতে আসুন।”

“আসি মা। গণনাটা শেষ করিয়া আসি।”

কিন্তু গণনা আর শেষ হয় না। খণ্ডায়ু, এ আয়ু সে আয়ু, লিখিতে লিখিতে ভূর্জ্জপত্র ভরিয়া গেল, তবু গণনা শেষ হয় না। আহারের বেলা, অতিরিক্ত হইয়া গেল।

খনা, শ্বশুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন শ্বশুর নানা মতে নানা আয়ু লিখিতেছেন। কোন মতে

২৪, কোন মতে ৪২, কোন মতে ৮৪; খনা বলিলেন,—“ঠাকুর—ইহার কোন আয়ু জাতক পাইবে?”

“শাস্ত্রে যাহা আছে, সবই পাইবে।”

“২৪, যাহার আয়ুমান, সে ৮৪ বৎসরও বাঁচিবে? যদি তাই বাঁচে, তবে ত উহার আয়ু ৮৪ই হইল। ২৪ লিখেন কেন? দুইটা আয়ু ঠিক হইতে পারে না।”

“শাস্ত্রে আছে।”

“শাস্ত্রের সঙ্গে কি বিচার নাই?”

বরাহ, মনে বুঝিলেন কথা ত ঠিকই। কিন্তু যে বিচার এতকাল নিজে করেন নাই, আজ এক বালিকার কথায় তাহা করিবেন? তাহা হইতেই পারেনা। বরাহ, নানা আয়ুই লিখিতে লাগিলেন। মনে মনে বধূর উপর ক্রোধও হইল।

খনাও শ্বশুরের বিচারহীন শাস্ত্রানুসরণ দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। এত বড় পণ্ডিত, ইহাঁর বিচারবুদ্ধি নাই, কি আশ্চর্য্য?

বিরক্ত হইয়া খনা, প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে শ্বশুরের এই আয়ু লহরীর গণনা শেষ হইবে, তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু গণনা আর শেষ হয় না। এ পণ্ডশ্রম ও বিচার

হীনতা, খনার অসহ্য হইয়া উঠিল ; বুঝি ক্রোধও হইল। খনা, ডাকিয়া বলিলেন ঃ—

"কিসের দিন কিসের বার,
জন্মনক্ষত্র কর সার,
কি কর শ্বশুর মতিহীন,
পলকে জীবন বার দিন।„

"মতিহীন" কথাটা খনার জিহ্বায় হঠাৎ উচ্চারিত হইয়া গেল। খনা, জিহ্বা দংশন করিলেন। বার বার বলিতে লাগিলেন—হায় বলিলাম কি? আমার এ অসংযত জিহ্বা না থাকাই ভাল। লজ্জায় সেই প্রতিভার মূর্ত্তি মলিন হইয়া গেল।

১৪

খনার এ বচন বরাহ শুনিলেন। 'মতিহীন' শব্দটি কালসর্পের ন্যায় তাঁহার মর্ম্মে দংশন করিল। বরাহ ডাকিলেন—"মিহির"। বৃদ্ধের স্বর কর্কশ।

মিহির গৃহান্তরে ছিলেন। এ আহ্বান শুনিয়াই বুঝিলেন প্রমাদ ঘটিয়াছে। বাবা, কোষ্ঠী গণিতেছিলেন, না জানি খনা কি বলিয়া ফেলিয়াছে। উত্তর করিলেন,—"কি বাবা"।

মিহির, পিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বৃদ্ধের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলেন, না জানি আজ কি প্রলয় ঘটে।

বরাহ বলিলেন—"মিহির, আর্য্যশাস্ত্রে পিতাকে কি বলে ?"

মিহির বলিলেন—বাবা,—

"পিতা ধর্ম্মঃ, পিতা স্বর্গঃ, পিতাহি পরমংতপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ।"

পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই সন্তানের পরম তপস্যা ; পিতা তুষ্ট হইলে সকল দেবতা তুষ্ট হন,—ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের অভিপ্রায় ।"

"আমি তোমার পিতা ; আমার আদেশ পালন করিবে ?"

"অবশ্য করিব । উহাই পুত্রের ধর্ম্ম ।"

"তুষ্ট হইলাম বৎস, শতায়ু হও । জান মিহির, পিতার আদেশে পরশুরাম, মাতৃহত্যাও করিয়াছিলেন ।

"জানি বাবা ! তোমার সন্তোষের জন্য আমাকে কি করিতে হইবে, বল । উহা পাপ হইলেও করিব, পুণ্য হইলেও করিব ; উহাই পুত্রের ধর্ম্ম ।"

"শোন, মিহির । বধূ, ডাকিনী । এখনই তুমি তাহার অসংযত জিহ্বা ছেদন কর ।"

"এখনই বাবা ?"

"হাঁ, এখনই ।"

"আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

খনা, রন্ধনশালায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, আর বারবার আপনার জিহ্বা দংশন করিতেছিলেন। কম্পিত পদে মিহির সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মিহিরকে দেখিয়াই খনা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন —আসিয়াছ স্বামিন্, ছুরী কই? ছুরী বাহির কর। এ জিহ্বা অসংযত, এখনই ছেদন কর। নহিলে খনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। বলিতে বলিতে খনা আপনার জিহ্বা টানিয়া ধরিলেন। খনার মূর্ত্তি ভীষণ।

দৈব চালিতের মত মিহির অগ্রসর হইয়া বাণীর পীঠস্বরূপ সেই জিহ্বায় ছুরিকার আঘাত করিলেন। জিহ্বা মাটীতে পড়িয়া গেল। রক্তের স্রোত বহিল।

খনা, স্বামীর দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন,—আমার অদৃষ্ট ফলিল; এখন চলিলাম স্বামিন্।

খনা, হাত বাড়াইয়া মিহিরের পায়ের ধূলা লইলেন।

মিহির আকুল প্রাণে ডাকিলেন—খনা, আমার খনা, —পত্নীঘাতী আমি, তোমায় ডাকিতেছি খনা। খনা অতিকষ্টে চক্ষু মেলিল, কিন্তু বলিবার শক্তি নাই, বাণীর আসন, সে দেহ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।

খনা, চক্ষু মেলিয়া ইঙ্গিত করিল। সে ইঙ্গিতে কতই

সান্ত্বনা। সে চক্ষু, যেন বলিল, তুমি কাঁদিওনা, তুমি কাঁদিলে এ মরণ আমার বড় দুঃখের হইবে। আমার অদৃষ্ট ফলিয়াছে, তোমার দোষ নাই। আমিত আগেই বলিয়াছি স্বামিন, অদৃষ্ট ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেনা।

মিহির আকুল প্রাণে সে রক্তস্নাতা মরণোন্মুখীকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রাণ ভরিয়া 'খনা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

সে করুণ আহ্বান শুনিয়া বরাহ দৌড়িয়া আসিলেন। পুত্রের কোলে রক্তস্নাতা বধূর মূর্ত্তি দেখিয়া বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন।

মিহির ডাকিল, বাবা, ঐ সে অসংযত জিহ্বা। ও জিহ্বা, চিরদিনের জন্য নীরব হইয়াছে।

বরাহের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায় হায় করিলাম কি?—বলিয়া বৃদ্ধ মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ক্রন্দনে আর খনার দেহে জীবন আনিতে পারিল না। সে উঠ মা, উঠ মা, রবে বৃদ্ধ আর বধূকে উঠাইতে পারিলেন না।

মুহূর্ত্তের অভিমান। সেই অভিমানে প্রতিভা চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল।

সম্পূর্ণ।